সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

রহমত আলী ছিদ্দিকী

সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি
তত্ত্ব ও প্রয়োগ

রহমত আলী ছিদ্দিকী
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯/মে ২০০২
[অর্থবর্ষ ২০০১-২০০২]

বাএ ৪১১৮

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকী বিদ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স
৬৭/৬৮ যোগীনগর, ওয়ারি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
নব্বই টাকা মাত্র

SAMAJIK GABESHANAR PADDHATI : TATTVA O PRAYOG (Method of Social Research : Theory and Practice) by Rahmat Ali Siddiqui. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Published : May 2002. Price : Tk. 90.00 only.

ISBN 984-07-4127-6

BANSDOC Library

উৎসর্গ

বাবা
মরহুম মুন্‌শী হাসান আলীকে
যাঁর অবদানে আমি
আজ এ পর্যায়ে

মুখবন্ধ

মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার প্রবণতা আমাদের দেশে অনেক আগে থেকে শুরু হলেও সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির মতো জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই রচিত হয় নি। সময়ের বাস্তব চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে রহমত আলী ছিদ্দিকীর বইখানি সমাজ গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে নতুন মাত্রা সংযোজন করল বলে আমি মনে করি। বইটিতে লেখক তাঁর স্বীয় যোগ্যতা ও মেধার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রযুক্তিনির্ভর আজকের যুগে সামাজিক গবেষণার মতো এমন একটি জটিল বিষয় কিভাবে কম্পিউটার প্রযুক্তির সহায়তায় স্বল্প সময়ে, অপেক্ষাকৃত নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা যায় তা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেই দেশের সামাজিক অবস্থার স্বরূপ নিরূপণ, সামাজিক সমস্যা, তার প্রকৃতি ও সমস্যার যথাযথ কারণ উদ্ঘাটন, সমস্যার সমাধানকল্পে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্পের চাহিদা নিরূপণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বর্তমানে অনেক দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দেশেও সামাজিক গবেষণার উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছে। সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে 'সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি' পাঠ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও নবীন গবেষকগণ বইটি ব্যবহারে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

আবুল বারকাত
প্রফেসর
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

BANSDOC Library
Accession No.....

ভূমিকা

সমাজ গবেষণা পদ্ধতির উপর বাংলা ভাষায় খুব কমসংখ্যক পুস্তক রচিত হয়েছে। সমাজ গবেষণার মতো এমন একটি জটিল বিষয়ে নবীন গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা ভাষায় একটি সহজবোধ্য পুস্তক রচনা করার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সমাজ গবেষকদের সাথে আলাপ-আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি তা হলো বাংলাদেশের নবীন সমাজ গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগামী করে তোলার জন্য সমাজ গবেষণা বিষয়ে সহজ-সরলভাবে মাতৃভাষায় লিখিত বই তাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। এই পুস্তকটি সে প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই রচিত হয়েছে।

সমাজ জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং তার যথাযথ সমাধানকল্পে সামাজিক সমস্যাসমূহের কারণ উদ্ঘাটনপূর্বক তা নিরসন সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করার দরকার হয়। তাই আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সামাজিক গবেষণার সহযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। বস্তুত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক গবেষণার ফলাফলের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান, সমাজ মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, সমাজকল্যাণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে 'সমাজ গবেষণা পদ্ধতি' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজ গবেষণা পদ্ধতি' সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত। তাই এ বইটি সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও নবীন গবেষকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই সামাজিক গবেষণার উপর বেশ কয়েকখানা বই বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। তবে সেগুলোর তুলনায় আমার এ বইখানার বিশেষত্ব এই যে, বর্তমানের কম্পিউটার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এটি রচিত। তথ্য সংগ্রহের পর তা প্রক্রিয়াজাতকরণ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কম্পিউটারের কোন কোন Software ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা যায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায়ে রয়েছে। আমার বিশ্বাস নবীন গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে ধারণা নিয়ে স্বীয় গবেষণাকর্মে কম্পিউটার ব্যবহার করে তাঁদের কাজের মান বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ পুস্তকের সবক'টি গ্রাফ ও চিত্র কম্পিউটারের বিভিন্ন Software ব্যবহারের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয়েছে।

বইটি রচনা করতে গিয়ে দেশী ও বিদেশী বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, ম্যানুয়েল প্রভৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে। এ কারণে ঐ সব বই-পুস্তক ও প্রবন্ধের লেখকদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ইউক্রেনে অবস্থান করার সময়ে ইউক্রেনের প্রফেসর গাদ্‌জি কোরবানভ, প্রফেসর গলদবার্গ ও প্রফেসর তাতিয়ানা পাভলভনা সমাজ গবেষণা বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। আমার লেখা আজকের এ বইখানা তাঁদের উৎসাহেরই ফসল। তাঁদের অবদানের কথা আমি এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ গবেষক প্রফেসর এম. এ. হামিদ তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে বইটি লেখার ব্যাপারে আমাকে দিকনির্দেশনা দান করেছেন বলে আমি তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর, সমাজ গবেষক ও অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বইটি লেখার ব্যাপারে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন বিধায় আমি তাঁর কাছে একান্তভাবে ঋণী। আমার স্ত্রী বিজলী ছিদ্দিকী সম্পূর্ণ বইটি নিজ হাতে কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিয়ে বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

বইটি ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ও নবীন গবেষকবৃন্দ যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অর্থনীতি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, জুন, ২০০১

রহমত আলী ছিদ্দিকী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সামাজিক গবেষণা ১

গবেষণার মৌলিক ধারণা ; মৌলিক ও ফলিত গবেষণা : সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য ; সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতা ; সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ; বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার ফলাফলের ব্যবহার

দ্বিতীয় অধ্যায় : সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি ১৩

নিয়মানুগ পদ্ধতি ; দার্শনিক পদ্ধতি ; ঐতিহাসিক পদ্ধতি ; পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ; বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি ; জরিপ পদ্ধতি ; সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণা ; তুলনামূলক পদ্ধতি ; নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ; লাইব্রেরি পদ্ধতি ; সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ; প্রশ্নমালা পদ্ধতি ; নমুনা পদ্ধতি ; বিবর্তনমূলক পদ্ধতি ; বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায় : সামাজিক গবেষণার কতিপয় উপাদান ২৩

তত্ত্ব ; তাত্ত্বিক কাঠামো ; প্রত্যয় ; তত্ত্ব গবেষণার ভিত্তি ; তত্ত্ব গঠনে গবেষণার ভূমিকা ; চলক ; বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলক ; স্বাধীন ও অধীন চলক ; সংজ্ঞা ; অনুমান বা প্রকল্পন

চতুর্থ অধ্যায় : তথ্য সন্নিবেশন কৌশল ৩১

তথ্য লিখন পদ্ধতি ; উদ্ধৃতি লিখন পদ্ধতি ; আলোচনা, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি ; পরোক্ষ উদ্ধৃতি ; উদ্ধৃতির উহ্য অংশ ; পাদটীকা ; গ্রন্থপঞ্জি

পঞ্চম অধ্যায় : সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় ৩৮

সামাজিক গবেষণার পর্যায়সমূহ ; গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন ; প্রকল্পন গঠন ; গবেষণার নকশা তৈরিকরণ ; প্রশ্নমালা প্রণয়ন ; তথ্য সংগ্রহকরণ ; প্রাথমিক ও গৌণ উৎস ; তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ; সাধারণীকরণ ; ফলাফলের তাৎপর্য নিরূপণ

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমাজ গবেষণায় রেটিং স্কেলের ব্যবহার ৪৫

রেটিং স্কেলের বিভিন্ন ধরন ; সংখ্যাভিত্তিক স্কেলসমূহ ; রৈখিক স্কেল ; স্ট্যান্ডার্ড স্কেলসমূহ ; ক্রম সমষ্টিমূলক রেটিং ; বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং ; রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতা এবং তা দূরীকরণের উপায়

সপ্তম অধ্যায় : গবেষণা নকশা ৫০

গবেষণা নকশা কি এবং কেন ; পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নকশার বিষয়সমূহ

অষ্টম অধ্যায় : তথ্য সংগ্রহ : সাক্ষাৎকার ৫৭

সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য ; সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণাবলি ; সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর গুণাবলি ; সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু ; সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ; সাক্ষাৎকারের ধরন ; আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ; অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ; অনুসূচি ; সাক্ষাৎকার

নির্দেশিকা ; সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ; সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কিভাবে উন্নত করা সম্ভব

নবম অধ্যায় : তথ্য সংগ্রহ ও প্রশ্নমালা ৬৫

প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য ; প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য ; প্রশ্নমালা ও অনুসূচি ; প্রশ্নমালার শ্রেণীবিভাগ ; নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা ; নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা ; উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ; উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা ; ডাকযোগে পাঠানো প্রশ্নমালা ; সামনাসামনি বিতরিত প্রশ্নমালা ; প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরির প্রক্রিয়া ও পর্যায়সমূহ ; প্রশ্নমালা পদ্ধতির সুবিধা ; প্রশ্নমালা পদ্ধতির অসুবিধা

দশম অধ্যায় : তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ ৭৯

পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য ; পর্যবেক্ষণের শ্রেণীবিভাগ ; প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ ; নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ; অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ; অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ ; পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ; পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

একাদশ অধ্যায় : তথ্য সংগ্রহ ও নমুনায়ন ৮৫

সমগ্রক ; নমুনা ; নমুনায়ন পদ্ধতি ; নমুনায়নের সিদ্ধান্ত ; নমুনায়ন ভিত্তি ; নমুনায়নের সুবিধা ; নমুনায়নের অসুবিধা ; নমুনায়নের প্রকারভেদ ; সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি ; সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন ; নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনায়ন ; স্তরিত নমুনায়ন ; গুচ্ছ নমুনায়ন; নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ; আনুমানিক অংশ নমুনায়ন ; আকস্মিক নমুনায়ন ; উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন

দ্বাদশ অধ্যায় : তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ৯৮

প্রশ্নমালা ও অনুসূচির সম্পাদনা ; সংকেতায়ন ; শ্রেণীবদ্ধকরণ ; শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ; পংক্তিতে সাজানো

ত্রয়োদশ অধ্যায় : তথ্য উপস্থাপন ১০৫

সারণিবদ্ধকরণ ; সারণির অংশসমূহ ; সারণি তৈরির নিয়মাবলি ; সারণিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা ; সারণির আকার ; রেখাচিত্র ; সারণির তুলনায় রেখাচিত্রের সুবিধাসমূহ ; রেখাচিত্র অঙ্কন ; কালীন লেখ ; ব্যাপ্তি রেখা ; স্তর রেখা ; আয়তলেখ ; গণসংখ্যা বহুভুজ; দণ্ডচিত্র ; যৌগিক দণ্ডচিত্র ; যুগল দণ্ডচিত্র ; বৃত্ত চিত্র ; রূপচিত্র ; মানচিত্র ; রেখাচিত্র অঙ্কনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

চতুর্দশ অধ্যায় : গবেষণা প্রতিবেদন লিখন ১২৮

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ; প্রতিবেদনের ধরন ; প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ; উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যাবলি ; প্রতিবেদনের রূপ কেমন হওয়া উচিত ; গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো ; প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

পরিশিষ্ট ১৪১

একটি প্রশ্নমালার নমুনা

গবেষণা পরিভাষা ১৫০

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৬

প্রথম অধ্যায়
সামাজিক গবেষণা
SOCIAL RESEARCH

গবেষণার মৌলিক ধারণা (Basic Concept of Research)

কোনো বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত কর্মপ্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়। C. R. Kothan বলেন, "One can also define research as a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. Infact, research is an art of scientific investigation." বর্তমান গবেষণা প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে প্রচলিত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে। গবেষণা সম্পর্কে ওগ বলেন, "গবেষণার ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা আসতে পারে ; আবার নাও আসতে পারে। জ্ঞাত কোনো বিষয়কে এটা সহায়তা করতে পারে ; আবার নাও করতে পারে। গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন কোনো জ্ঞান লাভ করা অথবা প্রচলিত জ্ঞানের নতুন মাত্রা সংযোজন করাই গবেষণার উদ্দেশ্য।" Redman এবং Mory গবেষণার ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "Reserch is a systematized effort to gain new knowledge." Dictionary of Current English-এ Research-এর অর্থ বলা হয়েছে—a careful investigation or inquiry specially through search for new facts in any branch of knowledge. গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করে কোনো প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করতে পারেন, আবার অতিরিক্ত নতুন প্রমাণাদির মাধ্যমে কোনো পুরাতন ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গবেষণার মাধ্যমে মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রকৃত জ্ঞানের কাছাকাছি হয়।

কৌতূহল প্রবণতা মানব মনের এক চিরন্তন প্রবৃত্তি। এই কৌতূহল প্রবণতা সেই আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। আর সে কারণেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জীবন-জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে এত ব্যগ্র। পারিপার্শ্বিক জীবন-জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী মানব মনে যে সব বহুমুখী প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে তার যথাযথ উত্তর লাভের আকাঙ্ক্ষায় গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ তথ্যসমূহকে যাচাই বাছাই করে নতুন জ্ঞান আহরণ করা বা প্রচলিত জ্ঞানের উন্নতি সাধনই গবেষণার কাজ।

মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (Basic and Applied Research)

গবেষণাকার্য একটা সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে শুরু হয়। অতঃপর সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপাত্ত বা তথ্য সংগৃহীত হয় এবং সংগৃহীত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে

সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত কেবল নতুন জ্ঞান সংযোজন করতে পারে, আবার বাস্তব কোনো সমস্যা সমাধানে বা কর্মসূচি প্রণয়নেও ব্যবহৃত হতে পারে। এ দুটি দিক বিচার করে গবেষণাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. মৌলিক গবেষণা (Basic or Fundamental Research)

২. ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা (Applied Research)

মৌলিক ও ফলিত গবেষণার বর্ণনা দিতে গিয়ে C. R. Kothari বলেন, "Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industrial/business organization, whereas fundamental research is mainly concerned with generalizations and with the formulation of a theory." মৌলিক গবেষণা বলতে মূল বা আদি (Original) গবেষণাকে বুঝানো হয়। একে আবার বিশুদ্ধ (pure) গবেষণা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। শুধু জ্ঞান লাভের জন্য বা জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধিশালী করে তোলার জন্য যে গবেষণা কাজ করে তাকে মৌলিক গবেষণা বলা হয়। কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ প্রকৃতির কোনো ঘটনা বা বিশুদ্ধ গণিত বা কোনো মৌলিক সমস্যা সমাধানে পরিচালিত গবেষণাকে মৌলিক গবেষণা বলা যেতে পারে। V. Young বলেন, "Gathering knowledge for knowledge's sake is termed 'pure' or 'basic' research." জ্ঞান আহরণই মৌলিক গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য। মৌলিক গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকের আহরিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে কিভাবে কতখানি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে তিনি আদৌ বিচলিত নন। পরবর্তীকালে তাঁর এই লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে ; কিন্তু বর্তমানে গবেষকের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ। নতুন জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে একটা বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং সেই জানার ফলশ্রুতিতে উক্ত বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই মৌলিক গবেষণার প্রধান কাজ। মৌলিক গবেষণা নিম্নোক্ত দুটি কাজ সম্পাদন করে। যথা :

১. নতুন কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার

২. বর্তমানে প্রচলিত তত্ত্বের উৎকর্ষসাধন

মৌলিক গবেষণা থেকে সাধারণত নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ নতুন, যার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে ছিল না। গবেষক এ ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ধৈর্য ও একাগ্রতার সমন্বিত প্রচেষ্টায় এহেন অসাধ্যকে সাধন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক যত বেশি প্রতিভাবান ও মেধাবী তাঁর উদ্ঘাটিত তত্ত্বও তত বেশি উৎকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ নিউটন, আইনস্টাইন, প্যারেটো, এডাম স্মিথ, কিনস, কার্ল মার্ক্স, ফ্রিদরিখ অ্যাঙ্গেলস, ফিসার প্রমুখ তাত্ত্বিক গবেষকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অপরপক্ষে, বর্তমানে প্রচলিত কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের কিছু কিছু অনুমানকে পরিবর্তন, সংশোধন, কিংবা পরিমার্জন করে প্রচলিত তত্ত্বটিকে চলিষ্ণু সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ করে তোলা হয়। এতে আলোচিত তত্ত্বটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানে কোনো তত্ত্ব চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না। কালের পরিক্রমায় সমাজের

পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব সামাজিক তত্ত্বের পরিবর্তন একান্তই জরুরি হয়ে পড়ে।

এ অবধি যা বলা হলো তা ছিল পুরোটাই মৌলিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এবার ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণার কথায় আসা যাক। কোনো গোষ্ঠী বা সমাজ, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সব বহুমুখী সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এহেন সমস্যাবলির সমাধান বের করাই ফলিত গবেষণার লক্ষ্য। তাই বলা যায় কোনো প্রচলিত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করা বা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কোনো কর্মসূচি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাকে ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা বলে। K. D. Baily তাঁর *Methods of Social Research* নামক গ্রন্থে বলেন, "Research to identify social, economic or political trends that may affect a particular institution or the copy research or the marketing research or evaluation research are examples of applied research. The central aim of applied research is to discover a solution for some pressing practical problems, whereas basic research is directed towards finding information that has a broad base of application and thus, adds to the already existing organized body of scientific knowledge." সামাজিক সমস্যাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলেই গবেষণার কাজ শেষ হয় না। সমস্যার প্রকৃত বা যথাযথ কারণ, সমস্যার প্রকৃতি ও সমাজের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব প্রভৃতি সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের পর সমস্যাবলি দূর করার নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা সুপারিশমালা পেশ করাই ফলিত গবেষণার কাজ। মানব কল্যাণের জন্য ফলিত গবেষণার প্রত্যক্ষ ব্যবহার রয়েছে।

যথাযথ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate Technology) ও উপকরণ ব্যবহার, পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ফলিত গবেষণার সার্থকতা নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত কাজসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে ফলিত গবেষণা সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে :

(ক) সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য যে-সব বিষয়ের প্রতি সমাজের সর্বসাধারণের নিকট থেকে সমর্থন ও বিশ্বাস আসা প্রয়োজন সে সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ফলিত গবেষণা তার গবেষণা প্রক্রিয়া পরিচালনা করলে তার প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) ফলিত গবেষণা মৌলিক গবেষণায় ব্যবহৃত কৌশলের উন্নয়ন ঘটায়।

(গ) সামান্যীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ফলিত গবেষণা উপাত্ত ও ধারণা সরবরাহ করে।

ফলিত গবেষণার গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ফলিত গবেষণার উন্নয়নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। মৌলিক বা বিশুদ্ধ গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এটাই বেশি

যুক্তিযুক্ত হবে যে, যদি তারা প্রচলিত ফলিত গবেষণার তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে (যেখানে মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে) এ নীতি পরিহারযোগ্য।

সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Research)

সামাজিক বিষয়সমূহের অনুসন্ধানের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম। তাই সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এখানে সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(ক) সঠিকভাবে গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য গবেষণার প্রথম থেকে শেষাবধি গবেষককে বেশকিছু সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তাই বলা যায় সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি। গবেষণার প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন করা হয়। গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর্যায় হতে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণার ফলাফল নির্ধারণ, সুপারিশমালা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী পরিচালনা করা হয় বিধায় সামাজিক গবেষণাকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

(খ) সামাজিক গবেষণা যুক্তিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। গবেষণাকারী তাঁর গবেষণার প্রতিটি পর্যায়েই আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, স্বীয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে গবেষণাকার্য পরিচালনা করবেন। ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি যেন কোনোক্রমেই গবেষণাকার্য বা গবেষণার ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে না পারে সেদিকে গবেষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। গবেষককে অবশ্যই তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা বিভিন্নভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

(গ) গবেষককে অনুমাননির্ভর তথ্য সংগ্রহ প্রবণতা দমন করতে হবে। কোনো অনুমানকে গবেষণায় সরাসরি স্থান দেওয়া চলবে না। অনুমানকে যাচাই-বাছাই করা গবেষকের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে। অনুমান যাচাইযোগ্য না হলে সে অনুমানের ভিত্তি থাকে না এবং তা গবেষণায় ব্যবহারের অনুপযোগী বলে গণ্য হবে।

(ঘ) গবেষণার ফলাফল প্রধানত নির্ভর করে গবেষণায় ব্যবহৃত বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিকভাবে সংগৃহীত তথ্যের উপর। সংবাদপত্র বা এ ধরনের মাধ্যমে ব্যবহৃত তথ্যের তুলনায় সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সংগ্রহ পদ্ধতি ভিন্নতর। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গবেষণার ক্ষেত্র বিবেচনা করে যথাযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কোন্ ক্ষেত্রের জন্য কোন্ পদ্ধতি উপযুক্ত তা বিচার-বিশ্লেষণ করে সন্দেহমুক্ত হয়ে ঐ বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। তথ্য সংগ্রহ করার কাজে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার

গ্রহণকারী বা পর্যবেক্ষককেও ঐ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে। বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা পর্যবেক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা পর্যবেক্ষকগণের দ্বারা যাতে তথ্য পক্ষপাতদোষে দুষ্ট না হয় গবেষণায় এ বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ গবেষণার ফলাফল নির্ভর করে মূলত বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর।

(ঙ) সামাজিক গবেষণা একটা মস্তবড় প্রক্রিয়া। বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করলেই গবেষণার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তথ্য সংগ্রহ করার পর সংগৃহীত তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য নিরূপণ, তথ্যসমূহের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণ এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সামান্যীকরণ করা ইত্যাদি কাজ গবেষণার মূল বিষয়।

(চ) সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সমগ্র গবেষণাকার্যটি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। সামাজিক গবেষণায় তাড়াহুড়ার কোনো স্থান নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, সামাজিক গবেষণা একটি মস্তবড় প্রক্রিয়া বিধায় এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। গবেষণা তড়িঘড়ি করে সম্পাদন করার বিষয় নয়। তড়িঘড়ি করে গবেষণা শেষ করলে তার ফলাফল আশানুরূপ হয় না এবং এহেন গবেষণার ফলাফল বাস্তবে কোনো কাজে আসে না। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত প্রতিটি পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকেই অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সুচিন্তাকারী হতে হবে। সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য পরিচালিত গবেষণাকর্মে সুচিন্তিত মতামত ও ধৈর্যশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

(ছ) সামাজিক গবেষণার ফলাফল মূলত যৌথভাবে পরিচালিত দলীয় কর্মপ্রচেষ্টার ফলাফল। বিভিন্ন গবেষক একটা সামাজিক সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হতে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং পরস্পরের জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সমগ্র গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গবেষণা বেশ কিছুসংখ্যক গবেষক দীর্ঘদিন যাবৎ যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন। বিশাল পরিসরের সামাজিক গবেষণায় একক ব্যক্তির পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে সাফল্য অর্জন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই এ ক্ষেত্রে সচরাচর উক্ত বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত দল বা গোষ্ঠী যৌথভাবে কাজ করেন। তাঁরা তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক সমস্যার পশ্চাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ইত্যাদি কারণ বিদ্যমান থাকে। সেক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা থেকে ভালো ফলাফল পেতে হলে একক ব্যক্তির পক্ষে তা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি যত অভিজ্ঞই হোক না কেন তার পক্ষে উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথার্থ দক্ষতা প্রদর্শন করা অসম্ভব। তাই এ ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, ডাক্তার ইত্যাদি পেশার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দল পারস্পরিক সহযোগিতার

ভিত্তিতে গবেষণা প্রক্রিয়াটি সার্থকভাবে সম্পাদন করতে পারে এবং তবেই উক্ত গবেষণার ফলাফল সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

(জ) গবেষণার প্রতিবেদনে গবেষণা কর্মের প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বসহকারে স্থান পায়। গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যয়ের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নমুনায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির পূর্ণ বর্ণনা প্রদান করা হয় এবং কেন এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো তার সপক্ষে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। সর্বদা গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতার স্বীকারোক্তি গবেষণায় স্থান পায়। গবেষণায় ব্যবহৃত বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখ থাকে।

(ঝ) সামাজিক সমস্যা নিয়ে পরিচালিত সামাজিক গবেষণার ফলাফল সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য আবিষ্কার সমাজ জীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সম্প্রসারিত করে। বিশেষ করে ফলিত গবেষণা সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ দেখায়, উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করে এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের যথার্থতা বিচার করে।

সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Social Research)

সামাজিক সমস্যা, সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সাধনভিত্তিক সামাজিক গবেষণা একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। Salahuddin M. Aminuzzaman তাঁর *Introduction to Social Research* নামক গ্রন্থে বলেন, "Lots of unpredictable conditions dictate the parameters of social research. Several factors inhibit the applicability of the findings of social research." সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতার দিকটি প্রথমে বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল সমাজ বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরাও এর সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

(ক) সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি বিশুদ্ধ (pure) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। তাই এ পদ্ধতিতে অন্যান্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অসম্ভব। সমাজ জীবনের প্রতিটি বিষয় সদাপরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রবণতা সব সমাজেই সমানভাবে সূচিত হয় না। সমাজভেদে ও সময়ের পার্থক্যের সাথে সাথে এই পরিবর্তনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার একই সমাজের বিভিন্ন এলাকায় এই পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি এক রকম নয়। এহেন তারতম্যের ফলশ্রুতি হিসেবে সামাজিক গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে সামান্যীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা বড়ই অসুবিধা হয়। অথচ অন্যান্য নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ফলাফলে সমাজ বা কাল ভেদে কোনোরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

(খ) সামাজিক গবেষণায় গবেষণার ক্ষেত্র গবেষণাগারে হাজির করা সম্ভব নয়। কারণ সামাজিক গবেষণায় গবেষণার ক্ষেত্র হলো সমাজ তথা সমাজের মানুষ ও তাদের সমস্যাবলি। অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গবেষণার বিষয় বা উপাদান অতি সহজে প্রয়োজনানুযায়ী গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সে

ক্ষেত্রে ঘটনার ধরন, ঘটনার প্রকৃতি, ঘটনার কারণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে একাধিকবার সংঘটিত করে পর্যবেক্ষণ করা যায়। সামাজিক গবেষণার বিষয় ও উপাদান গবেষণার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ এগুলোকে সমাজের মাঝে রেখেই এর গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যেহেতু এগুলো সমাজের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো সামাজিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও উপাদানসমূহ গবেষণার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

(গ) বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো সামাজিক গবেষণায় গবেষণার বিষয় ও উপাদান তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিষয় দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় তা স্পষ্টরূপে অবলোকন করা যায় না। তাই গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় এবং তাদের প্রভাব নিরূপণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) সামাজিক গবেষণার বিষয় এবং উপাদানসমূহের প্রভাব বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যাবলি বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সমস্যাবলি ও ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, মার্কিন ডলারের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে তা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রভাব সমগ্র বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অথবা মধ্যপ্রাচ্যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে সমগ্র বহির্বিশ্বের অর্থনীতির উপর তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু এই প্রভাব এত পরোক্ষ যে তার অস্তিত্ব কোনো এলাকায় বা গোষ্ঠীতে অবস্থান করে গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও ঘটনাসমূহ সমাজের অর্থ-সামাজিক কারণসমূহ দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, তার মধ্যে সরাসরি পূর্বের অবস্থা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

(ঙ) সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতার আর একটা দিক হলো তার উপাদানসমূহের সঠিক পরিমাপ-অযোগ্যতা। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার উপাদানসমূহকে যেমন সঠিক ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়, সামাজিক গবেষণায় তা মোটেও সম্ভব নয়। সামাজিক গবেষণা সচরাচর গুণাত্মক বিষয় নিয়ে কাজ করে। তাই গুণাত্মক বিষয়সমূহ সংখ্যাভিত্তিক পরিমাপের মতো সঠিক ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। যেমন গ্রামীণ বাংলার সাধারণ মানুষের মতামত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এমন দুটি মতামত পাওয়া গেল যে, অগভীর নলকূপের তুলনায় গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করাকে তারা প্রাধান্য দেয়। এই প্রাধান্যের মাত্রার পরিমাণ কতটুকু এবং তা কোন এককের মাধ্যমে নিরূপণ করতে হবে তা সঠিকভাবে বলা এবং করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

(চ) সামাজিক গবেষণা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। স্বয়ং গবেষকের এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের স্বীয় চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা গবেষণা প্রক্রিয়া প্রভাবিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষকই বলুন আর তথ্য সংগ্রহকারীর কথাই বলুন, কারো পক্ষেই স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল

গবেষণাকর্ম উপহার দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। স্বয়ং Karl Marx লিখেছেন, "as a party man I have a thoroughly hostile attitude towards Comet's philosophy, while as a scientific man I have a very poor opinion of it." আবার Goode and Hatt বলেন, "Since science is the work of scientists, and since scientists share in the values of their culture, it is clear that science and values are related through the motivations of men." সামাজিক গবেষণা কি কি ধরনের পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হতে পারে সে কথা বলতে গিয়ে Spencer নিম্নলিখিত পক্ষপাতসমূহের কথা উল্লেখ করেন :

(a) The Bias of patriotism,
(b) The Class Bias,
(c) The Political Bias,
(d) The Logical Bias,
(e) The Intellectual and Emotional Bias.

সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা (Need for Social Research)

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ একে অন্যের সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। একদিকে সে অন্যের সম্পর্কে জানতে চায় অন্য দিকে সে চায় অন্যেরা তাকে জানুক, বুঝুক, উপভোগ করুক। দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়, এক সমাজের লোক অন্য সমাজে গিয়ে বসবাস করতে থাকলে তার কাছ থেকে অন্যেরা তার সমাজ সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে চায়। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন বিষয়, উপাদান, ঘটনা ও সমস্যাবলি সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার গতিপ্রকৃতি, সমস্যা বা ঘটনার কারণ, সমস্যা সমাধানের সুপারিশমালা প্রণয়ন ইত্যাদি কঠিন কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এ কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক গবেষণা। Salahuddin M. Aminuzzaman তাঁর *Introduction to Social Research* নামক গ্রন্থে বলেন, "Social research is a rigorous course of social investigation to explore and uncover yet unknown facts, logical premises and the dynamics of social institutions, processes, behavior and critical interactions." সামাজিক গবেষণা আমাদেরকে সমাজ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। এ নতুন জ্ঞান লাভের মাধ্যমে সমাজের মানুষ একদিকে যেমন সমাজ সম্পর্কে নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারের প্রসার ঘটায় তেমনি অন্য দিকে এই জ্ঞানের আলোকে সমাজকে পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণে তৎপর হয়। সমাজে যে-সব ঘটনা ও সমস্যা রহস্যাবৃত, সামাজিক গবেষণা সেগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়। বর্তমানে কোনো সমাজ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা বা জ্ঞান তা ক্রমশ পরিবর্তিত হয় নতুন নতুন সামাজিক গবেষণার আলোকে। সামাজিক গবেষণা সমাজ থেকে মিথ্যা, অপপ্রচার ও কুসংস্কার দূরীভূত করে। সামাজিক গবেষণা সমাজ থেকে ভ্রান্তবিশ্বাস ও ত্রুটিযুক্ত অপ্রযোজ্য তত্ত্বের ত্রুটিগুলো দূর করে এবং ভ্রান্ততত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে তার স্থলে যথাযোগ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা ঘটায়। পরবর্তীকালে আবার গবেষণার মাধ্যমে

বর্তমান তত্ত্বের উন্নতি, সমৃদ্ধি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন করা হয়। Young সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, "Social research is persistently opening our eyes to the social reality, simplifying the mysterious within the seemingly common place in social life and shattering its garments of makebelieve by which pious hands have hidden their uglier features. The obvious function of research is to add new knowledge to its existing store, but its power of cleansing our minds of cliches and removing the rubbish of inapplicable theory are equally notable. Scientific research ... is also a rejective process, especially in social science ... understanding can be (advanced) not only by gains in knowledge but also by discarding outworn assumptions." নিচে সামাজিক গবেষণার আবশ্যকতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

(ক) বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করেছে। সামাজিক গবেষণা এ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, সমুদয় সম্পদের হিসাব-নিকাশ, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন হয়। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাই গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করলে তা বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা থেকে সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হয়।

(খ) সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে আমরা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করি। এই সব নতুন জ্ঞানকে ভিত্তি করে আমরা সমাজের উক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে পারি। Social research generates the firsthand information regarding social institutions, pattern of social interactions and network of power relationships and overall social dynamics [Salahuddin M. Aminuzzaman (1991), *Introduction to Social Research*].

(গ) সামাজিক গবেষণার উন্নতির সাথে সাথে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়। সমাজ সম্পর্কে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে এবং গতানুগতিক চিন্তাধারা পরিহার করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) সামাজিক গবেষণা সামাজিক সমস্যার মূল কারণ নির্দেশ করে। তাই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা সমস্যার প্রকৃত কারণে গিয়ে আঘাত হানে এবং উক্ত সামাজিক পরিকল্পনা থেকে সুদূরপ্রসারী ফলাফল লাভ করা যায়। অপরদিকে, সমস্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন না করে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সেই পরিকল্পনা সমাজের জন্য বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করে।

(ঙ) সামাজিক গবেষণা সামাজিক সমস্যা ও ঘটনাবলির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করে। তাই সামাজিক গবেষণার আলোকে সমাজের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। সামাজিক ঘটনাবলি সমাজের পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনা ও উপাদান দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। তাই এক সমাজের ভবিষ্যদ্বাণী অন্য সমাজের ক্ষেত্রে সরাসরি সত্য বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে। তবে সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকলে সমাজের পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনা ও উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনাসমূহ কী পরিবর্তিত আকারে ঘটবে তার রূপরেখাও অঙ্কন করা যায় এবং সে অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়।

(চ) দীর্ঘ দিনের গবেষণা অভিজ্ঞতার ফলে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এভাবে দীর্ঘ দিনের গবেষণা অভিজ্ঞতা বলে যথোপযুক্ত ও ত্রুটিমুক্ত গবেষণা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় যার ব্যবহারে সামাজিক গবেষণায় স্বল্প সময়ে সুদূরপ্রসারী ফলাফল লাভ করা যায়।

উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও C. R. Kothari-এর মতে সামাজিক গবেষণার নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলো রয়েছে :

(a) To those students who are to write a master's or Ph. D. thesis, research may mean a careerism or a way to attain a high position in the social structure ;

(b) To professionals in research methodology, research may mean a source of livelihood ;

(c) To philosophers and thinkers, research may mean the outlet for new ideas and insights ;

(d) To literary men and women, research may mean the development of new styles and creative work ;

(e) To analysts and intellectuals, research may mean the generalizations of new theories.

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার ফলাফলের ব্যবহার (Use of Social Research Findings in Bangladesh)

সামাজিক গবেষণার একটা বৃহত্তর দিক হলো সমাজে এর ব্যবহারিক মূল্য অসীম। সামাজিক গবেষণা শুধু গবেষণার জন্যই গবেষণা নয়। একথা জেনে রাখা দরকার যে, যে-কোনো ফলিত গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে এবং তার সঠিক বাস্তবায়নে যথার্থ সহায়তা করা। বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার অভিজ্ঞতা অতি অল্প দিনের। অল্প কিছুদিন আগেও সামাজিক গবেষণার প্রতি কারো তেমন কোনো নজর ছিল না। সঠিকভাবে সামাজিক গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য তেমন কোনো উদ্যোক্তা বা উপযুক্ত কোনো সংগঠন ছিল না। ইতোমধ্যে উন্নত বিশ্বে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা যে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে তার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের উপরও। এরই ফলে সরকারি প্রশাসন ও দেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক মহল বিশেষ

করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ সামাজিক গবেষণার ব্যবহারিক দিকটির কথা বিবেচনা করে সামাজিক গবেষণা কর্মে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিপূর্বেকার সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা বছরের পর বছর ধরে আমাদের জমা হয়ে আছে। কারণ সেখানে সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনার পূর্বশর্ত হিসেবে সামাজিক গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। এর ফলেই দেশের অর্থ ও সম্পদেরই শুধু অপচয় ঘটেছে, বাস্তবে কোনো নীতি বা উন্নয়ন পরিকল্পনা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। কারণ, "Data and information is the essential prerequisites for the preparation of any plan. Any planning exercise therefore requires a reliable data base, factual knowledge on which a course of action could be developed and the difficulties in its implementation anticipated. Development plan therefore needs varied types of data and information related to different socioeconomic indicators. Social research findings for that matter, generate a comprehensive data and information base for planning exercises either in macro or micro level. Social research provides the detailed and comprehensive picture of the socio-economic conditions, levels and comprehensive picture of the socio-economic conditions, levels of aspiration of the people at large." (Salahuddin M. Aminuzzaman ; 1991)

বর্তমান যুগ গবেষণার যুগ। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়া যথার্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা অসম্ভব। একথা বাংলাদেশের পরিকল্পনা বিশারদগণ ইতোমধ্যেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ-অনুদানকারী দাতা দেশগুলোর চাপে বর্তমানে সরকার এবং দেশী-বিদেশী অনেক সংস্থা বাংলাদেশের নানা বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে।' (নাজমির নূর বেগম, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, পৃ. ৩৭)। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সামাজিক গবেষণার ফলাফল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার ব্যাপকতা, গতিপ্রকৃতি, বিভিন্নতা বা ধরন দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ বা যে কোনো ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক গবেষণার ফলাফলের উপর নির্ভরশীলতাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান যুগের সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যাপক এবং জটিল। তাই গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকলে সঠিক পন্থায় গবেষণাকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই এখন অনেক সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। গবেষণা পরিচালনার ব্যাপারে ইদানীং আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও গবেষণালব্ধ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা অনেক কম। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটাবার সূক্ষ্ম তৎপরতা চালান।

যে কোনো ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা জরিপ (Feasibility study) করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যে কোনো সামাজিক উন্নয়নমূলক নীতি বা উন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রহণের সময় মূল্যায়ন জরিপ বা গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচনায় আনতে হয়। আমাদের দেশের কর্মকর্তাগণ সাধারণত অফিস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নিজেদেরকে এত ব্যস্ততার মধ্যে ফেলে দেন যে, তাঁদের পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক গবেষণার প্রতিবেদনসমূহ যত্নের সাথে পড়ার সুযোগ ও সময় হয়ে ওঠে না। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক গবেষণাকার্য সম্পাদনকারী গবেষকগণ তাঁদের সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম সমাপ্ত হলেই চরম তুষ্টি ও পরম প্রশান্তি লাভ করে বসে থাকেন। গবেষণার প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার মহান উদ্যোগটুকুও তাঁরা আর গ্রহণ করেন না। ফলে গবেষণার ফলাফল গবেষকদের গণ্ডি পেরিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বা কর্মকর্তাদের হাতে এসে পৌঁছে না। এ কারণে গবেষণার ফলাফলের ভবিষ্যৎ প্রয়োগ-সম্ভাবনা সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত গবেষণার ফলাফল দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই গবেষকদের শুধু গবেষণাকার্য সম্পাদন করেই প্রশান্তি লাভ করলে চলবে না। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য যাতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি
METHODS OF SOCIAL RESEARCH

পদ্ধতিগত দিকটি সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই সমাজ গবেষণার উপর এর পদ্ধতিগত দিকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যুগ যুগ ধরে সমাজ গবেষকরা সমাজ গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন এবং পাশাপাশি বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গবেষক এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন গবেষণাকার্য পরিচালনা করে থাকেন। গবেষণার বিষয় ও ধারা অনুসারে সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে পাবার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। গবেষক তাঁর সুবিধার্থে পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে এক বা একাধিক পদ্ধতি বেছে নেন। গবেষণা পদ্ধতির আসল উদ্দেশ্য হলো গবেষণার বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। প্রকৃতপক্ষে যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গবেষণা পদ্ধতির দ্বারা সামাজিক আচার আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ দ্বারা সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত :

* কিভাবে বস্তুনিষ্ঠ সমাজ গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব ?
* কিভাবে সামাজিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায় ?
* কিভাবে সামাজিক তত্ত্ব গঠনের প্রক্রিয়া ও কৌশল আবিষ্কার করা যায় ?
* সামাজিক গবেষণায় এমন কি তত্ত্ব আছে যার দ্বারা সমাজের সব প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব ?
* প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো তাত্ত্বিক আবিষ্কার সামাজিক বিজ্ঞানে সম্ভব কি ?

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর সামাজিক গবেষকগণ এখনও খুঁজে পান নি। কিন্তু তাই বলে সমাজ গবেষণা থেমে নেই। সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমানে গবেষণাকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে-সব পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে থাকেন তা নিচে দেওয়া হলো :

* নিয়মানুগ পদ্ধতি (Normative Method)
* দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method)
* ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)
* পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)
* বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি (Case Study Method)
* জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)
* তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

RAMSDOC Library * Dhaka *

* নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Anthropological Method)
* লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method)
* সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method)
* প্রশ্নমালা পদ্ধতি (Questionnaire Method)
* নমুনা পদ্ধতি (Sample Method)
* বিবর্তনমূলক পদ্ধতি (Evolutionary Method)
* বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method)

১. নিয়মানুগ পদ্ধতি

নিয়মানুগ পদ্ধতিতে ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উভয়ই সমানভাবে গুরুত্ব পায়। গবেষণার যে-সব ক্ষেত্রে চলক নির্ণয় করা মোটেও সম্ভব নয়, সে-সব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের জন্য নিয়মানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। গবেষণার যে-সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় কেবল সে-সব ক্ষেত্রেই পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির সাহায্যে সরকার, অর্থনীতি, দর্শন, ধর্ম, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্রমপরিবর্তনশীল বিষয়ের জন্য মান বা গড় অথবা পরিমিত অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে সে-সব মান আধুনিক করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। জনসংখ্যা, উৎপাদন বা আইন প্রণয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য পরিসংখ্যানিক তথ্যের প্রয়োজন হলে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে মূল বিষয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করা হয়।

২. দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণার প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সমাজ গবেষণায় কোনো প্রকার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল না। এ পদ্ধতিকে আবার ভেরস্টিহেন (Verstehen) পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়। সেন্ট সাইমন, অগাস্ট কঁৎ, হবহাউস, স্পেন্সার, লাডউইগ, গামপ্লেভিক, গাস্টভ, জর্জ সিমেল, গ্রেব্রিল টার্ড প্রভৃতি সমাজবিদ দার্শনিক পদ্ধতিতে সমাজ গবেষণা পরিচালনা করে গেছেন। দার্শনিক পদ্ধতি মূলত যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারা। এ পদ্ধতি সমাজ এবং সমাজের প্রকৃতি বিষয়ক মানুষের চিন্তাধারার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পাইথাগোরাস থেকে শুরু করে প্লেটো, এরিস্টটল প্রভৃতি সমাজ দার্শনিক এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ সম্পর্কে সামান্যীকরণের প্রচেষ্টা চালান। তখন থেকেই সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে।

ভেরস্টিহেন বলতে অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধিকে বুঝায়। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের প্রকাশ্য আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবন করা সম্ভব। সমাজ গবেষকগণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমাজ জীবনের বিচার-বিশ্লেষণ করে তার অর্থবহ ও বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন। উপলব্ধির মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণের ব্যাপারে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি ব্যতিরেকে অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা

বিষয়ক বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সত্ত্বেও সামাজিক ঘটনাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যৌক্তিক সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বলা যায়, দার্শনিক পদ্ধতি বা ভেরস্টিহেন পদ্ধতির সহায়তায় সামাজিক গবেষণা জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। ভেরস্টিহেন পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

* প্রকল্প নির্মাণ করা
* বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা।

প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই রয়েছে। সমাজকে সামগ্রিকভাবে (Society as a whole) বুঝবার বা বুঝাবার ক্ষেত্রে দার্শনিক পদ্ধতির তুলনা হয় না। হেগেল, এঙ্গেল্‌স, মার্ক্স প্রমুখ দার্শনিক যেভাবে উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের এবং সামাজিক বিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিছু কিছু সামাজিক বিষয় রয়েছে যার সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়। যেমন, সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জন্ম ও মৃত্যুর হার, প্রজনন ক্ষমতা, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার, নগরায়ণের হার, বেকারত্বের পরিমাণ নির্ণয়, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ, বেকার প্রবণতার গতিবিধি নিরূপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংখ্যাভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে অবস্থার যথাযথ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন না করলে জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। একথা সত্য যে, সামাজিক অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে দার্শনিক ও সংখ্যাভিত্তিক উভয় পদ্ধতিরই সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তবে ইদানীং সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা একটু অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছেন। সময়ের দাবিতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

৩. ঐতিহাসিক পদ্ধতি

ইতোমধ্যেই সমাজ গবেষণা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের সবারই জানা আছে যে, অতীতকে আশ্রয় করেই রচিত হয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্র ধরেই কার্ল মার্ক্স ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার (Social System) রূপরেখা অঙ্কন করেছেন এবং বিবর্তনের ধারাকে তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) নামে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি, কার্যধারা ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। মানব সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি কার্যকলাপের অতীত ইতিহাস বর্তমান অবস্থার সাথে অনায়াসেই তুলনা করা যায় এবং এ কারণেই ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

একটি গতিশীল সত্তা হিসেবে সমাজের সংগঠন ও কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজবিজ্ঞানীদের সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, প্রতিটি সামাজিক দল, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিসত্তা সদা-সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এরই ফলে দল, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভূমিকা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। তাই

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের মধ্যেই অতীত সমাজের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তাই সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অতীত আদৌ অবহেলার বিষয় নয়। কারণ অতীত সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার থাকলে বর্তমানকেও সহজেই বুঝা যায়। অতীতের ভুল-ত্রুটি ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অবলম্বনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা-সমস্যা নিরূপণ করা বেশ কঠিন। এ ক্ষেত্রে গবেষণা-সমস্যাটিকে ব্যাপক পরিধিতে বিস্তৃত না করে বরং একটি সীমিত পরিসরে আবদ্ধ রেখে সমস্যার উপর গভীর বিশ্লেষণকার্য পরিচালনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ বেশ কষ্টসাধ্য। কারণ গবেষণার প্রয়োজনে যে সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে সময় গবেষকের সময় অপেক্ষা বহু পূর্বের এবং তখনকার সময়ের এমন একজন ব্যক্তিকেও বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না যার কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। ফলে গবেষককে পূর্ববর্তী অন্য ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। গবেষকের পক্ষে এ অবস্থায় আস্থার সাথে কাজ করা দুষ্কর।

৪. পরীক্ষামূলক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বহুলব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। দীর্ঘদিন যাবৎ এ পদ্ধতি এককভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়াও সামাজিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় এই পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে। সামাজিক গবেষণায় গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা না গেলেও সুচিন্তিত ও সযত্ন পরীক্ষণ নকশা বা ভিন্ন মডেল অনুসরণ করে সামাজিক গবেষণায়ও পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে গবেষণার অন্তর্গত দলসমূহ থেকে একটিকে নিয়ন্ত্রিত দল এবং একই বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অপর দলকে অনিয়ন্ত্রিত দল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এমতাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দলটির উপর পরীক্ষণ পরিচালনা করে ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। একজন গবেষক এই পদ্ধতির মাধ্যমে দলসমূহ বা সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ নিজের কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতিতে একজন গবেষক তাঁর অনুসরণীয় প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের কাজের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে উপযুক্ত পরীক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন।

৫. বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি

সামাজিক সমস্যার উন্মেষ ও বিকাশের ধারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সমীক্ষার ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে ছোট হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সমীক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো একক সীমাবদ্ধ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়। যে কোনো একটি বিষয়, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দলকে একটি গবেষণা একক হিসেবে বিবেচনা করে সে সম্পর্কে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিষয়টির যথার্থ বিশ্লেষণই বিষয়-সমীক্ষার প্রধান

কাজ। এ ক্ষেত্রে বিষয়টির পূর্বাবস্থা, বর্তমান অবস্থা, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অবস্থা, কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর যথেষ্ট অনুসন্ধান চালানো হয়। বিষয়-সমীক্ষার ফলে গৃহীত বিষয়টি যথেষ্ট জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দেখা যায় যে, অতীতে অন্য কোনো গবেষক উক্ত সমস্যা নিয়ে এত বিস্তারিত সমীক্ষা চালান নি।

এই পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

* সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ;
* গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে ;
* যথার্থভাবে সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে ;
* প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে ; এবং
* সংগৃহীত তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

বিষয়-সমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বহুমুখী বিষয় ও ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর প্রকল্প বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ন্যায়সংগত অংশ হলেও একটিমাত্র বিষয়-সমীক্ষা অসম্পূর্ণ কারণ এবং এজন্যই মাত্র একটি বিষয় বা ঘটনা থেকে সমগ্র বিষয় সম্পর্কে কোনো যুক্তিপূর্ণ সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৬. জরিপ পদ্ধতি

তথ্যানুসন্ধানের জন্য সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি একটি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি বহুকালের পুরাতন পদ্ধতি। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান যুগের জটিল সমাজব্যবস্থা সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজকে জটিল করে তুলেছে। তাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার তাগিদে জরিপ পদ্ধতিকেও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা হয়েছে।

জরিপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষক পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে নেন যে, কোন বিষয়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি এমনভাবে তাঁর জরিপের উপকরণসমূহ প্রস্তুত করেন যাতে অতি সহজেই তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়। জরিপ কাজের সুবিধার্থে পরিচালিত জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকারমালা, ছক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে অতি সহজেই জরিপ পরিচালনাকারী তাঁর সংগৃহীত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি রেকর্ডভুক্ত করতে পারেন।

সামাজিক কোনো বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা চলে।

* স্বল্পসংখ্যক বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান ;
* বিশাল পরিধির বহু সংখ্যক বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান।

জরিপ পদ্ধতি এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুসন্ধান পদ্ধতি। কারণ, বাস্তব কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিশাল পরিধির সমস্যাবলি নিয়ে জরিপ পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। জরিপ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে পরিকল্পনাবিদ, সাংবাদিক, দার্শনিক, গবেষক, সমাজকর্মী, বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাদের

স্ব স্ব বিষয়ে ত্বরিত অনুসন্ধান চালিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

কোনো এলাকার বা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সেই এলাকার বা দেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। কারণ যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা না থাকলে উক্ত বিষয়ের উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। জরিপের সাহায্যে কোনো এলাকার বা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ের সঠিক অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ছাড়াও সেই এলাকা বা দেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাহিদা, অবস্থা, সমস্যা ও সমস্যার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ তথ্যসম্বলিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তাই আজকাল অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনাই জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক জরিপ এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণা

অনেকেই সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণাকে একই অর্থে ব্যবহার করে ফেলেন। অথচ সামাজিক জরিপ গবেষণা পরিচালনার একটি পদ্ধতি মাত্র। গবেষণা সঠিকভাবে পরিচালনা করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উক্ত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সামাজিক জরিপ বা জরিপ পদ্ধতি মাত্র একটি পদ্ধতি। সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণা উভয়ই সমাজকে পর্যালোচনা করলেও এদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। বিশেষ কোনো এলাকার জনগণ, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, তাদের সমস্যা, সমস্যার কারণসমূহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সামাজিক জরিপ পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে সামাজিক গবেষণার কাজ তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এটি সুদূরপ্রসারী। এটা নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতি খুঁজে বের করতে চায়।

৭. তুলনামূলক পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণার জন্য তুলনামূলক পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ভিন্নতর পরিবেশে একই প্রতিষ্ঠানের বা একই পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের, কার্যক্রম বা সমস্যাবলি তুলনার পথ সহজ হয়। ঘটনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যের পরিমাণ ও অসামঞ্জস্যের পরিমাণ উভয়ই লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি ঘটনা পৃথিবীর কোনো স্থানে যেভাবে ঘটে অন্য স্থানে সেভাবে কেন ঘটে না এই পদ্ধতির মাধ্যমে তারও যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। পরিসংখ্যানিক তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতির সাহায্যে ঘটনার সঠিক তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব। ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয় একটি পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল ঘটনাসমূহের চলকের ভিত্তিতে নির্মিত সারণীর সাহায্যে ঘটনাবলির পরিবর্তনশীলতার পারস্পরিক তুলনা করা সহজ হয়।

৮. নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। অনেক ধরনের সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে আদিম সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, পরিবার, সরকার, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যের দরকার হয়। সে ক্ষেত্রে গবেষক দীর্ঘদিন ধরে কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে পূর্বে প্রধানত আদিম সমাজ বিষয়ক গবেষণাকার্য পরিচালনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আজকের সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপরও গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য যে কৌশল গৃহীত হয় তাকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ কৌশল বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষককে ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁকে স্বয়ং দীর্ঘদিন যাবত (এক বা একাধিক বছর) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান করতে হয়। কারণ কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা স্বল্প সময়ের কাজ নয়। কাজেই কেবল দীর্ঘদিন ঘটনাসমূহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বলেই উক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে-সব বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় তা সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে গবেষক যে-সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে চান সে সম্পর্কে তাঁকে একটি পূর্বপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। পরবর্তীকালে সেই পরিকল্পনার সূত্র ধরে ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। এই পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে গবেষককে দীর্ঘ দিন ধরে একটি বিশেষ শ্রেণীর দল বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করতে হয় বিধায় তাঁর স্বীয় গুণাগুণ দ্বারা যাতে উক্ত দলটি প্রভাবান্বিত না হয় বা দলটির প্রতি তিনিও যাতে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি না হারান সেদিকে গবেষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯. লাইব্রেরি পদ্ধতি

গবেষণার ক্ষেত্রে লাইব্রেরি পদ্ধতিকে পূর্বে কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। অথচ বর্তমানে এই পদ্ধতি গবেষণার জন্য একটি উত্তম ও প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক কি কাজ করেছেন, তাঁদের কাজের সীমাবদ্ধতা ও উক্ত বিষয়ে কি কি কাজ বাকি আছে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য লাইব্রেরি পদ্ধতি খুবই উপযোগী। তাছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে এই পদ্ধতি গবেষককে যথেষ্ট সহায়তা করে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই পদ্ধতিতে শুধু বর্তমান জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে এর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

১০. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

বর্তমান কালে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গবেষক স্বয়ং বা তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধির দ্বারা গবেষণা এলাকার অধিবাসীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। কোনো বিষয়ে পূর্বে পরিচালিত গবেষণার পুনঃমূল্যায়নের জন্য বর্তমানে এই পদ্ধতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগৃহীত হয় বিধায় উক্ত ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরশীলতার মাত্রা অনেক বেশি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়ের ব্যাপারে গবেষণা এলাকার অধিবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের আর একটি বিশেষ সুবিধার দিক হলো সাক্ষাৎকার দানের সময় সাক্ষাৎকার দাতার মনোভাব ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনবোধে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। একই প্রশ্ন বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আসল উত্তর বের করার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। এভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য সংগৃহীত তথ্যের বিভিন্নতা পরীক্ষা করা সহজ হয় এবং তাঁর পক্ষে বিভিন্নমুখী তথ্যের মধ্য থেকে সঠিক তথ্য বাছাইয়ের ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

ক্ষেত্রবিশেষে লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষক গবেষণা এলাকার অধিবাসীদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হলে তাদের আস্থা অর্জনে অসমর্থ হন। এর ফলে অধিবাসীগণ খোলাখুলিভাবে সঠিক তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অনীহা ভাব পোষণ করে। তাই গবেষকের উচিত হবে গবেষণা এলাকার অধিবাসীদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব থেকেই জ্ঞান লাভ করা এবং উক্ত জ্ঞানবলেই তাদের সাথে সহজ-সরল ও খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করা সম্ভব।

অনেক সময় এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, অধিবাসীগণ মৌখিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে তারা মৌখিকভাবে তথ্য সরবরাহের পরিবর্তে প্রশ্নমালার উত্তর প্রদানের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তার কলা-কৌশল প্রয়োগের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। এমন অনেক দেখা যায় যে, প্রথমে সাক্ষাৎকার দাতা মৌখিকভাবে সাক্ষাৎকার দানে অস্বীকৃতি জানালেও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর বুঝানোর পর বহু সাক্ষাৎকার দাতাই সাক্ষাৎকার দানের ব্যাপারে রাজি হয়ে পড়ে। কাজেই সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর এই পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভরশীল। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টম অধ্যায় দেখুন)

১১. প্রশ্নমালা পদ্ধতি

বিশাল পরিধির জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয় যার উত্তরগুলো সম্ভব হলে যাতে 'হাঁ' বা 'না' যোগে দেওয়া যায় সেদিকে প্রশ্নমালা প্রণয়নকারী সজাগ দৃষ্টি রাখেন। প্রত্যেক উত্তরদাতার নিকট একটি করে প্রশ্নপত্র ডাকযোগে অথবা অন্য কোনো উপায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরদাতাগণ সেটি যথাযথভাবে পূরণ করে গবেষকের নিকট ফেরত

পাঠিয়ে দেন। গবেষণা বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা প্রশ্নমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে গবেষককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এর সহজবোধ্যতা। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তথ্য সংগ্রহকারীর সাহায্য ছাড়াই প্রশ্নপত্র পূরণ করতে পারে। আজকাল অনেক গবেষণাতেই তথ্য সংগ্রহের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে এই পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যথেষ্ট সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতির কিছু ত্রুটি রয়েছে। প্রশ্নকর্তার অনুপস্থিতিতে উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম করতে পারেন। এতে উত্তর দানের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগৃহীত হয় না। এমনও হতে পারে উত্তরদাতা তার উত্তর দানের বিষয়ে প্রশ্নকর্তার ন্যায় সচেতন ও যত্নবান নয়। সে ক্ষেত্রেও কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ হবে না। এ ছাড়াও রয়েছে সংগৃহীত উপাত্তের ব্যাখ্যা প্রদান নিয়ে সমস্যা। সংগৃহীত উপাত্তের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গবেষক তাঁর নিরপেক্ষতা হারিয়ে সুবিধামতো নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করে সম্পূর্ণ গবেষণার সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য নবম অধ্যায় দেখুন)

১২. নমুনা পদ্ধতি

নমুনা পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার ব্যবহারে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সমগ্রক সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই গবেষককে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সমগ্রক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে বলা হয় আরোহ অনুমান বা তথ্যমূলক উপপত্তি (Statistical Induction)। সমাজ গবেষণায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পক্ষে বহু ক্ষেত্রেই সমগ্রকের সমস্ত অংশ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো গবেষক বাংলাদেশের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, কিন্তু সময় ও ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষকের কাছ থেকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় গবেষককে শুমারি জরিপের বদলে নমুনা জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচাবার জন্য এই পদ্ধতি একটি উত্তম পদ্ধতি। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য একাদশ অধ্যায় দেখুন)

১৩. বিবর্তনমূলক পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধানসমূহের প্রত্যেকটির ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। এহেন সমীক্ষায় পূর্ব থেকেই ধরে নেওয়া হয় যে, বিভিন্নমুখী সামাজিক ঘটনার প্রকৃত উৎপত্তি একই রূপ। যদি ক্ষেত্রবিশেষে এর অন্যথা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে, তা পরিবর্তনশীল পরিবেশের কারণে ঘটেছে। আসলে বিবর্তনমূলক পদ্ধতিকে 'ক্রম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি' হিসেবেও অভিহিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী শ্রেণী পূর্ববর্তী শ্রেণীর সাথে দারুণভাবে সম্পর্কিত বিধায় যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় সব শ্রেণী সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়।

১৪. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি

ইদানীংকালে সামাজিক গবেষণায় একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে। গণসংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়ের রীতিবদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ দু'ভাবে ব্যবহৃত হয় :

(১) সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসেবে ; এবং

(২) সামাজিক গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে।

এই পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক তথ্যে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য সাধারণত প্রথম পর্যায়ে সুস্পষ্ট থাকে না। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত তথ্যসমূহকে বিচার-বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবদ্ধকরণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণ সাধারণত গুণবাচক তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি হলো সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসেবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রাথমিক ভূমিকা।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকা হলো গণযোগাযোগের প্রকাশ্য বিষয়াবলির বস্তুনিষ্ঠ, নিয়মাবদ্ধ এবং গুণাত্মক বর্ণনা প্রদান। এই পদ্ধতি গুণাত্মক তথ্যকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করতে এবং সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাবলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার জন্য চিরাচরিত পুনশ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা সমালোচনা করার চেয়ে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তুলনামূলকভাবে তা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে রীতিবদ্ধ ও বস্তুনিরপেক্ষ করে তোলা যায়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাবলির বিষয়বস্তু যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হলে যে বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তা নিম্নরূপ :

* বিশ্লেষণের শ্রেণীবিভাগ দ্বারা বিষয়বস্তুভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন সম্পাদন করা।
* নমুনায় অন্তর্ভুক্ত প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় পদ্ধতিগতভাবে শ্রেণীবদ্ধকরণ।
* সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় নমুনার সঙ্গে তুলনা করে প্রকাশিত বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন ধারণার গুরুত্ব পরিমাপ করা।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক গবেষণার কতিপয় উপাদান
SOME ELEMENTS OF SOCIAL RESEARCH

বিজ্ঞান সুশৃঙ্খল জ্ঞানের সমষ্টি। বিজ্ঞানের এহেন সংজ্ঞা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে। এর একটি হলো সুশৃঙ্খল (Systematic) এবং অপরটি হলো জ্ঞান (Knowledge)। বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে এ দুটি প্রত্যয়কে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর সুশৃঙ্খল ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হবে। সুশৃঙ্খল ধর্মতত্ত্বে বেশ কিছুসংখ্যক প্রত্যয়কে সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে উক্ত প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কতকগুলো সিদ্ধান্ত টানা হয়। অথচ যেসব প্রত্যয়কে ভিত্তি-প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার সত্যাসত্য একবারও বিচার করে দেখার অবকাশ নেই। কাজেই এর থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহও প্রমাণযোগ্য নয়। এখানেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সুশৃঙ্খল ধর্মতত্ত্বের মূল পার্থক্য।

অপরপক্ষে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এমন কিছু প্রমাণসত্য প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে যা স্বতঃসিদ্ধ তথ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, ২+৩=৫, $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ইত্যাদি। যদি কারো মনে এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় নিয়ে কোনো সন্দেহ জাগে, তবে সে ইচ্ছা করলে প্রমাণ করে দেখতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞান জাগতিক ঘটনাবলিকে বুঝবার জন্য বা বুঝাবার জন্য তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। ঘটনাবলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাই কোনো বিষয় বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হতে হলে তাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ সুশৃঙ্খল জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

তত্ত্ব (Theory)

'তত্ত্ব' শব্দটির সাথে বর্তমান যুগের সবাই আমরা কমবেশি পরিচিত। তাই বর্তমানে একজন গবেষক যখন তত্ত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন তখন যে কেউই তা বুঝতে পারে। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, একজন গবেষক যখন তত্ত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তিনি তা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রথম দিকে তত্ত্ব অনেকটা কল্পনাশ্রয়ী ছিল। তখন একে অনেকটা অবাস্তব ও কল্পনাধর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমানে তত্ত্বের ভিত্তি পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু পূর্বে এসব বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। বিজ্ঞানের উন্নতির পাশাপাশি তত্ত্ব তথ্যের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তত্ত্ব ও তথ্যের প্রগাঢ় সম্পর্ককে আধুনিক কালের বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। অনেকেই তত্ত্ব ও তথ্য শব্দদ্বয়কে সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত

নয়। সাধারণ মানুষ তত্ত্ব ও তথ্যকে পরস্পর বিপরীতধর্মী হিসেবে গণ্য করে। তারা তত্ত্বকে কল্পনা এবং তথ্যকে সত্য এবং বাস্তব বলে মনে করে। তথ্যকে সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আধুনিক যুগে তত্ত্বের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

* বর্তমানে প্রচলিত জ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করা ;
* পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাবলি ও তাদের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা ;
* পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাবলি ও তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা।

বর্তমানে কোনো তত্ত্বকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয় না যদিও তা অভিজ্ঞতালব্ধ বহু সংখ্যক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। নতুন জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে পূর্বের বহু তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বর্তমানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কোনো তত্ত্বই চূড়ান্ত বা স্থির নয়। তত্ত্ব হলো গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহের সামান্যীকরণের ফল। গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সামান্যীকরণের মাধ্যমে তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাই প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সামান্যীকরণের ফলে সৃষ্ট তত্ত্ব কখনই অপরিবর্তনীয় ও স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে টিকে থাকে না।

তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical Framework)

তত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ হলো চলকের পরিবর্তন প্রবণতা ব্যাখ্যা করা এবং উক্ত চলকের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বানুমান (Prediction) করা। এ ছাড়াও তত্ত্ব চলকের পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যকারণ সম্পর্কের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। যে-কোনো সামাজিক সমস্যাই অত্যন্ত জটিল এবং একটি সমস্যা অপর কয়েকটির সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই গবেষণার বিষয় হিসেবে গৃহীত সামাজিক যে-কোনো সমস্যারই যথার্থ নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং এহেন সমস্যাবলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক কারণসমূহের মিথস্ক্রিয়া (Interaction) সংক্রান্ত বিষয়টি একে আরো জটিল করে তোলে। তাই সামাজিক গবেষকগণ কোনো সামাজিক ঘটনার বা ঘটনাবলির মিথস্ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানকালে সাধারণত প্রতিষ্ঠিত কিছুসংখ্যক তত্ত্বের (Established Theories) সমন্বয় সাধন করত বিশ্লেষণমূলক কাঠামো (Analytical Framework) দাঁড় করান। এর মাধ্যমে গবেষকগণ ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামোর (Integrated Framework) সন্ধান পান। সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণের নিমিত্তে এই সমন্বিত কাঠামোকে গবেষণার ভাষায় তাত্ত্বিক কাঠামো বলা হয়।

তাত্ত্বিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসৃত। তাই সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে ঘটনার ব্যাখ্যা ও প্রমাণ, প্রকল্প গঠন, প্রকল্পনের সত্যাসত্যের প্রমাণ এবং বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাত্ত্বিক কাঠামো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ (Logical reason), দার্শনিক ফরমায়েস (Philosophical guideline) এবং বিশ্লেষণের ধরন (Mode of analysis) সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়।

প্রত্যয় (Concept)

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বের মতো প্রত্যয়ের গুরুত্বও অপরিসীম। তবে তত্ত্ব ও তথ্যকে যেভাবে সাধারণ মানুষও দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকে প্রত্যয় শব্দটি সেভাবে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যয় শুধু গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যয় হলো পর্যবেক্ষণকৃত কতকগুলো ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বিমূর্ত রূপ। পৃথিবীতে এমন কোনো জ্ঞান নেই যা কোনো না কোনোভাবে বিমূর্ত ধারণার মাধ্যমে সংগঠিত নয়। প্রত্যয় বহুবিধ ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো বহু সংখ্যক ঘটনাকে একত্রিতকরণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত শিরোনামে তা প্রকাশ করা। যেমন সিংহ, হাতি, বাঘ, হরিণ ইত্যাদিকে 'পশু' শিরোনামের অধীনে আনা যায়। সমাজ গবেষকগণ প্রত্যয় বলতে কোনো সমাজের অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে সঠিক ও যথার্থ শব্দ চয়নকে বুঝে থাকেন। সঠিক প্রত্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা যথার্থ ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কার্ল মার্ক্স ধনতন্ত্রে পুঁজির মালিক কর্তৃক পুঁজিহীন শ্রমিকদের শোষণের ফলাফলকে বুঝাবার জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। 'উদ্বৃত্ত মূল্য' প্রত্যয়টির মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত অনেকগুলো ঘটনার ও অবস্থার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে কোনো বিষয়ের বৈজ্ঞানিক রূপ লাভের জন্য প্রত্যয় নির্মাণ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয়।

গবেষক বা বিজ্ঞানী যে সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, তিনি সেই সমস্যা বর্ণনার জন্য উপযোগী ভাষা ও প্রত্যয় তৈরি করে থাকেন। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়। গবেষক যে বিষয় নিয়ে কাজ করেন সেই বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ থেকেই সেই বিষয়ের উপর প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমস্যা চিহ্নিত করেন, সমস্যার সমাধান করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল অন্যের অবগতির জন্য প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীরা কোনো ঘটনা বা ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে অতি সহজ উপায়ে সব থেকে কমসংখ্যক প্রত্যয় ব্যবহার করে উক্ত কাজগুলো সমাপন করার চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে তত্ত্ব সব থেকে কম সংখ্যক সহজবোধ্য প্রত্যয়ের মাধ্যমে বেশি সংখ্যক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম সেটিই সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব হিসেবে বিবেচ্য।

তত্ত্ব গবেষণার ভিত্তি

তত্ত্ব ও গবেষণার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। তত্ত্ব ও গবেষণা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তত্ত্ব ব্যতিরেকে গবেষণা উপযোগী ক্ষেত্র খুঁজে বের করা অসম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করার ব্যাপারে তত্ত্ব অত্যন্ত সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা গবেষণার ফলাফলকে তত্ত্বাকারে প্রকাশ করলে তা ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে ওঠে। তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল অধিকতর অর্থবহ হয়।

একদিকে যেমন তত্ত্ব ছাড়া গবেষণাকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তেমনি অন্যদিকে গবেষণা ব্যতিরেকে তত্ত্বের উদ্ভব আশা করা যায় না। তত্ত্বকে গবেষণার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সে কারণেই কোনো বিষয়ে গবেষণাকার্য দাঁড় করাতে হলেই প্রথমেই

সে বিষয়ে প্রচলিত তত্ত্বসমূহ পর্যালোচনা করত সে সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব কল্পনা করতে হয়। এহেন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রচলিত তত্ত্বের পরিবর্তন, সংশোধন বা বিলোপ সাধন হয়ে পরিবর্তিত, সংশোধিত বা সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্বের অবতারণা ঘটে।

তত্ত্ব গঠনে গবেষণার ভূমিকা

সব গবেষণা থেকেই তত্ত্ব গঠিত হয় না। সমাজ গবেষকদের মধ্যে তত্ত্ব সৃষ্টির প্রয়াস অত্যন্ত সীমিত। অধিকাংশ সমাজ গবেষণাই তথ্য সংগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায়। সমাজ গবেষকদের এহেন নাজুক অবস্থা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়া, ইউরোপ এমন কি যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজ গবেষণায় তত্ত্ব গঠনের প্রয়াস অত্যন্ত সীমিত। সমাজ গবেষকদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক গবেষকই তত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

একদিকে তত্ত্ব যেমন গবেষণাকে তার ক্ষেত্র তৈরির পথ দেখায় এবং গবেষণার ফলাফলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে, তেমনি গবেষণা প্রচলিত তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব গঠন করে। এই অবস্থার আলোকে সমাজ গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি নিয়ম লক্ষ্য করা যায় (ড. খুরশিদ আলম, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৯) :

* কোনো প্রচলিত তত্ত্বের সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা (সংশোধিত তত্ত্ব) ;
* কোনো তত্ত্বের বিপরীতধর্মী বা বিকল্প কোনো তত্ত্ব গঠন করা (বিকল্প তত্ত্ব) ;
* একেবারে নতুন তত্ত্ব গঠন করা (নতুন তত্ত্ব)।

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে একজন গবেষক উপর্যুক্ত তিনটি ধারণার যে-কোনো একটি বা একাধিক ধারা অনুসরণ করতে পারেন। গবেষণাকার্য পরিচালনার পূর্বেই গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তাই গবেষক পূর্ব থেকেই অবগত নন যে তাঁর গবেষণার ফলাফল কী দাঁড়াবে—কোন ধরনের তত্ত্ব সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। তাই সমাজ গবেষককে যে কোনো ধরনের তত্ত্ব গঠনের জন্যই যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়।

চলক (Variables)

গবেষণাকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে চলক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। গবেষণার মাধ্যমে গবেষক প্রাণী বা বস্তুজগতের বিভিন্ন বিষয় বা বস্তুর বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এক প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে বা এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে পরিবর্তনযোগ্য। এভাবে যখন কোনো একটি বিশেষ পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য এক প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে বা এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে পরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচ্য হয় তখন প্রাণী বা বস্তুর সেই বৈশিষ্ট্যকে চলক বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক এককের মধ্যে মাত্রাগতভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে। যেমন, আয়, ব্যয়, মূল্যমান, ওজন, উচ্চতা, জন্মহার, মৃত্যুহার, উৎপাদন, বয়স ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে

জানা থাকা দরকার যে, সব ধরনের প্রপঞ্চকেই সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে গুণবাচকভাবে তথ্যের প্রকাশ ঘটানোর দরকার হয়।

কোনো অনুসন্ধানের অশোধিত উপাত্ত সংখ্যা দ্বারা বা যে কোনো ধরনের পরিমাপের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই উপাত্তসমূহ গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনেরই হতে পারে। যে কোনো ধরনের অনুসন্ধানে কোনো গবেষণাকারী কোনো বস্তু বা বস্তুর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যকে যদি আছে বা নেই বলে চিহ্নিত করেন এবং ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কত ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে আছে বা নেই তা নির্ণয় করেন, তাহলে ঐ উপাত্তকে গুণবাচক উপাত্ত বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর নিজেস্ব তৈরিকৃত মশানিধন ঔষধ ছিটিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাঁর তৈরিকৃত ঔষধ মশা নিধনের ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকর বা কার্যকর নয় এমন উপাত্তকে গুণবাচক উপাত্ত বলে। গুণবাচক বৈশিষ্ট্যকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মানুষের গায়ের রং, চোখের রং, চুলের বর্ণ ইত্যাদিকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তিতে পরিবর্তনযোগ্য কিন্তু সংখ্যা দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য। সামাজিক গবেষণায় পরিমাণগত চলক ও গুণগত বৈশিষ্ট্য উভয়ের উপরই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলক (Discrete and Continuous Variables)

চলক দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—বিচ্ছিন্ন (Discrete) ও অবিচ্ছিন্ন (Continuous)। সব ধরনের চলকের ক্ষেত্রে একই প্রকারের পরিমাপ সম্ভব হয় না। কোনো কোনো ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগতভাবেই অবিভাজ্য এবং তাদেরকে শুধু গণনা করা যায়। তাদেরকে ভেঙে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই ধরনের চলককে বিচ্ছিন্ন চলক বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে চলককে মানের প্রত্যেক ভগ্নাংশে দেখানো যায় না এবং শুধু পূর্ণ সংখ্যার ভিত্তিতে দেখান যায় সেই চলককে বিচ্ছিন্ন চলক বলে। বিচ্ছিন্ন তথ্য সরাসরি পরিমাপের উপযোগী নয় এবং এদেরকে গণনা করতে হয়। বিচ্ছিন্ন চলক সঠিক পরিমাপের উপযোগী। একটি পরিবারের লোকসংখ্যা, কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা, বাজারে দোকানের সংখ্যা, কোনো দেশের শহরের সংখ্যা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। বিচ্ছিন্ন তথ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না। এক একক হতে অন্য একক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে।

অবিচ্ছিন্ন চলক একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে যে কোনো সংখ্যামান হতে পারে। অবিচ্ছিন্ন চলকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই চলক ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হয়। এর মানসমূহ একটি হতে অপরটিতে সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত। অবিচ্ছিন্ন চলকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিমাপের সম্পূর্ণ সঠিকতা হাসিল করা কঠিন। উৎপাদন, জন্মহার, মৃত্যুহার, আয়, বয়স, ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চলকের বাস্তব উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

BANSDOC Library * Dhaka *

বিচ্ছিন্ন চলক

সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে নাভদিয়া গ্রামের পরিবারসমূহের গণসংখ্যা নিবেশন

পরিবারের সদস্যসংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা
০২	১৫
০৩	৩২
০৪	৩৫
০৫	৪১
০৬	৫২
০৭	৪০
০৮	৩১
০৯	১২
১০	০৮
১১	০৪
১২	০১
মোট	২৭১

অবিচ্ছিন্ন চলক

সাপ্তাহিক ধূমপান সংক্রান্ত ব্যয়ের ভিত্তিতে পরিবারের গণসংখ্যা নিবেশন

সাপ্তাহিক ধূমপান ব্যয়	পরিবারের সংখ্যা
১০–১৯	১০
২০–২৯	২১
৩০–৩৯	৩৫
৪০–৪৯	৩৭
৫০–৫৯	৩২
৬০–৬৯	৩০
৭০–৭৯	২২
৮০–৮৯	১৫
৯০–৯৯	১১
১০০–১০৯	০৪
মোট	২১৭

স্বাধীন ও অধীন চলক (Independent and Dependent Variables)

সম্পর্কের ভিত্তিতে চলককে স্বাধীন ও অধীন এই দু'ভাবে ভাগ করা হয়। যে চলকের মান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না তাকে স্বাধীন চলক বলে। গবেষকগণ স্বাধীন চলককে অন্য

বিষয়, অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের উপর কী প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা নির্ণয় করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ করেন। অপরপক্ষে অধীন চলকের মান স্বাধীন চলকের মানের উপর নির্ভরশীল। অধীন চলক স্বাধীন চলকের প্রভাবে সৃষ্টি হয় ও পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক খণ্ড জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা হলো। এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের বিভিন্ন মাত্রা স্বাধীন চলক এবং জমির বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন অধীন চলক। কারণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জমির উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। নিম্নে আরো একটি উদাহরণ সহযোগে স্বাধীন ও অধীন চলকের ধারণাকে পরিষ্কার করা হলো :

$Y = 3X$

X	1	2	3	4
Y	3	6	9	12

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, X-এর মান হিসেবে যদি আমরা 1-কে গ্রহণ করি তবে সেক্ষেত্রে Y-এর মান দাঁড়ায় 3। এভাবে X-এর মান যখন ধরা হবে 2, তখন Y-এর মান দাঁড়াবে 6 ; X-এর মান যখন ধরা হবে 3, তখন Y-এর মান দাঁড়াবে 9 এবং X-এর মান যখন ধরা হবে 4, তখন Y-এর মান দাঁড়াবে 12। কাজেই এ ক্ষেত্রে X স্বাধীন চলক এবং Y অধীন চলক।

সংজ্ঞা (Definition)

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে কার্যকরী সংজ্ঞা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। শুধু সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনো বিষয়ের বর্ণনা প্রদানের সময় তা সুনির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে-বিষয়টি দিয়ে বর্ণনা করা হবে প্রথমে তারই যথাযথ সংজ্ঞা প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা যথাযথ না হলে সম্পূর্ণ গবেষণাকার্যটিই অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে। যদি গবেষণায় পরিবার, সমাজ, আয়, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয় ব্যবহৃত হয় তাহলে এগুলোর যথাযথ কার্যকরী সংজ্ঞা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। পরিবারের সংজ্ঞায় অস্পষ্টতা থাকলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো দেখা দিতে পারে :

* স্বামী বা স্ত্রীর অবর্তমানে যে কোনো একজন একাকী বসবাস করলে তাকে পরিবার হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা ;
* পিতা-মাতার অবর্তমানে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে একাকী বসবাস করলে সেটাকে পরিবার হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা ;
* কাজের লোক, ঝি, গৃহশিক্ষক, আশ্রিত ব্যক্তি ইত্যাদিকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা ;
* পরিবারের ছেলে-মেয়ে যারা বিভিন্ন কাজে শহরে থাকে তাদেরকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে কিনা ;

* স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বা দীর্ঘকালীন সময় ধরে পরিবারের কোনো সদস্য বিদেশে অবস্থান করলে তাকে পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা।

এভাবে সমাজ, আয়, উৎপাদন ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোর বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সংজ্ঞা প্রদান করে সুস্পষ্ট করতে হবে।

অনুমান বা প্রকল্পন (Hypothesis)

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পন তৈরি খুবই জরুরি একটি বিষয়। সমাজ সম্পর্কে কোনো গবেষণার সময় প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীকেই গবেষণার উপযোগী এক বা একাধিক অনুমান ধরে নিতে হয়। গবেষণার শুরুতেই গবেষক তাঁর স্বীয় বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেন এবং নিজের অতীত অভিজ্ঞতা ও স্বীয় পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এভাবে গবেষণার শুরুতেই গৃহীত অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে প্রকল্পন বা অনুমান বলা হয়। পরবর্তীকালে গবেষক বাস্তবে কাজ করে স্বীয় বিষয়ে গৃহীত অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর অস্থায়ী সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে দেখেন। অনেক সময় তাঁর পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়, আবার অনেক সময় তা বাতিল বলে গণ্য হয়। নিম্নে প্রকল্পনের কয়েকটি উৎসের উল্লেখ করা হলো :

* পূর্ববর্তী কোনো গবেষণাকর্ম পাঠ থেকে বর্তমান গবেষকের মনে নতুন অনুমানের অবতারণা ঘটতে পারে ;
* বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সাথে আলাপকালে কোনো একটি বিষয়ে একজন গবেষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে এবং তার থেকেই অনুমানের সৃষ্টি হতে পারে ;
* বিভিন্ন গবেষকের সাথে আলাপ প্রসঙ্গেও একজন গবেষকের মনে নতুন অনুমানের অবতারণা হতে পারে ;
* বাস্তব জগতে কাজ–কর্ম করতে করতেও কোনো বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে এবং তার থেকেও একজন গবেষকের অনুমান সৃষ্টি হতে পারে ;
* সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের ফলেও একজন গবেষকের মনে একটি বা একাধিক অনুমান সৃষ্টি হতে পারে ;
* সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও অনুমানের উদ্ভব ঘটতে পারে।

এভাবে জীবন ও জগতের বিভিন্ন উৎস থেকে অনুমানের সৃষ্টি হতে পারে। তবে একথা জানাও দরকার যে, একজন গবেষকের কাছে অনুমান সৃষ্টি অপেক্ষা সৃষ্ট অনুমান যাচাই–বাছাই–এর মাধ্যমে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণই সব থেকে বেশি জরুরি।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য সন্নিবেশন কৌশল
TECHNIQUES OF INFORMATION COLLECTION

গবেষণার উৎস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের স্বার্থে উৎস সংক্রান্ত বিষয়ে যত ধরনের তথ্য ও প্রকাশনা পাওয়া যায় তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা আবশ্যক। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। উৎস থেকে বিশেষ বিশেষ তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির জন্য এহেন কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন হয়। কৌশলগুলো নিম্নরূপ :

(১) অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে রাখতে হবে।

(২) গবেষকের সুবিধা অনুযায়ী একটি অস্থায়ী গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উৎস পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। কার্ড ক্যাটালগ ও সূচি অনুসন্ধান করে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান চালাতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সর্বক্ষেত্রেই যে সরাসরি পাওয়া যাবে এমন নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত তথ্যসমূহ সরাসরিভাবে কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায় না। এজন্য অনেক খোঁজাখুঁজি ও প্রচুর অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। স্বীয় সুবিধার্থে যে সব পুস্তকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হয় তাদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা ভালো। সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠাসমূহ হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হতে পারে। কিন্তু এটি কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। সুশৃঙ্খলভাবে অনুসন্ধান চালানোর জন্য সম্ভাব্য পুস্তকগুলোর সূচির তালিকার শিরোনামগুলো ভালোভাবে দেখা প্রয়োজন। এভাবে শিরোনাম সম্বলিত অধ্যায়সমূহ খুঁজে বের করা যায়।

কোনো অধ্যায় যদি গবেষকের কাছে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয় তাহলে তিনি অধ্যায়টির প্রথম ও শেষের অংশ ভালোভাবে পড়ে দেখতে পারেন। কারণ মূল বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবনায় ও উপসংহারে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়। যদি সম্পূর্ণ অধ্যায়টিই পাঠের প্রয়োজন হয় তাহলে চোখ বুলিয়ে যাবার রীতিও প্রচলিত আছে। অধ্যায়ের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি যত্নের সাথে পাঠ করা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের মূলভাব উক্ত অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য থেকে অনুধাবন করা যায়।

তথ্যলিখন পদ্ধতি

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য শনাক্ত করার পর ভবিষ্যতে গবেষণার স্বার্থে যাতে সেগুলোকে ব্যবহার করা যায় সেই লক্ষ্যে শনাক্তকৃত তথ্যসমূহ লিখে রাখা অত্যন্ত দরকার। শনাক্তকৃত তথ্যসমূহ লিখে রাখার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে :

(১) প্রথমেই স্থির করতে হবে কী লিখতে হবে, কতটুকু লিখতে হবে এবং কিভাবে লিখতে হবে।

(২) প্রত্যেক স্বতন্ত্র ধারণা বা বিষয় পৃথক পৃথক কাগজে বা কার্ডে লিখে রাখতে হবে।

(৩) লেখার সময় যা ভবিষ্যতে দরকার হবে বলে বর্তমানে মনে করা হচ্ছে তার সবই লিখে রাখতে হবে।

(৪) যা লিখে রাখা হচ্ছে তা যেন পরিপূর্ণ, সঠিক ও নির্ভুল হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

লেখার প্রথমেই কি লিখতে হবে, কতটুকু লিখতে হবে এবং কিভাবে লিখতে হবে তা পূর্বপরিকল্পিত না হলে লিখতে বসে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এতে বার বার কাটাকাটি ও ভুল-ত্রুটি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে যায়। ফলে যথেষ্ট কালক্ষেপণের পাশাপাশি গবেষকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ধারণা বা বিষয় পৃথক পৃথক কাগজে লিখে রাখার পেছনে যুক্তি হলো এই যে, গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন লেখার সময় যাতে সব ধারণাই ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদনে স্থান পায়। একই কাগজে বিভিন্ন ধারণা লিখে রাখলে ব্যবহারের সময় সেগুলো খুঁজে পেতে দেরি হয় এবং এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণাই গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।

ভবিষ্যতে যে-সব ধারণা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন লেখার সময় প্রয়োজন হবে তা পূর্ণভাবে লিখে রাখার পেছনে যুক্তি হলো এই যে, প্রতিবেদন লেখার সময় ধারণাসমূহের কোন্ কোন্ বিশেষ অংশের প্রয়োজন হবে তা পূর্ব থেকে স্থির করা সম্ভব নয়। তাই ধারণাসমূহের সম্পূর্ণ অংশ লেখা না থাকলে খসড়া প্রতিবেদন তৈরির সময় ধারণাসমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলো লেখার মাঝে খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে। এতে আবার ধারণাসমূহের সম্পূর্ণ অংশ সংগ্রহের জন্য পেছনের দিকে ফিরে যেতে হয়।

ভবিষ্যতে কার্যকরী ব্যবহারের আশায় যা লিখে রাখা হচ্ছে তা যদি সঠিক ও নির্ভুল না হয় তবে তার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। সংগৃহীত ধারণার মধ্যে যদি ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তা সমস্ত গবেষণাকর্মকেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিতে পারে।

তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করাকালে তথ্যের উৎসের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি লিখে রাখা ভালো। এতে পরবর্তী কালে প্রয়োজন হলে উৎসসমূহের পৃষ্ঠা নম্বর ধরে তথ্যসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়।

ধারণা ও তথ্যসমূহ লেখার সময় পরবর্তীকালে সেগুলো কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার একটা পূর্বপরিকল্পনাস্বরূপ খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যদি বর্তমান গবেষক মনে করেন যে, লেখকের বক্তব্য সরাসরি বলা প্রয়োজন, তাহলে কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনে উক্ত বক্তব্য প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি (Quotation) হিসেবে স্থান পাবে। প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় অবশ্যই উৎসের উল্লেখ করতে হবে। গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় গবেষকের নিজ বক্তব্যের সমর্থনে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত বা বক্তব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে।

উদ্ধৃতি লিখন পদ্ধতি

কোনো লেখকের বক্তব্যের শব্দ, বানান, উচ্চারণ প্রভৃতি অপরিবর্তিত রেখে আদি ও অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করাকে 'উদ্ধৃতি' (Quotation) বলা হয়। উদ্ধৃতিগুলোকে সাধারণত উদ্ধৃতি চিহ্নের (" ") মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। সাধারণত কোনো উদ্ধৃতি টাইপ করা লাইনের তিন লাইন অপেক্ষা বড় হলে তা মূল লেখা থেকে এক স্পেস (Space) নিচে উপস্থাপন করতে হয় এবং উদ্ধৃত অংশটুকু মূল লেখার আধা ইঞ্চি ডান দিক থেকে অবস্থান করে। যদি কোনো ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির চিহ্ন ব্যবহার করা না হয় তাহলে অংশটি যে উদ্ধৃতি তা বুঝাবার জন্য উদ্ধৃতির উৎসের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। নিচে এর উদাহরণ দেওয়া হলো :

> Unless innovation policy interventions are introduced to combat market imperfections, rural financial institutions may not succeed. The process of development is itself unlikely to resolve market imperfections (Stigitz 1993).
>
> Although financial liberalization policies have improved conditions in many countries, many credit institutions still depend on continued government support (Cho and Khatkate 1989).

কোনো পুস্তক, জার্নাল বা প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উদ্ধৃতিগুলো যেন আকারে ছোট হয়। উদ্ধৃতিগুলো পারতপক্ষে আধা পৃষ্ঠার কম রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তা কোনোক্রমেই যেন একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার বেশি না হয়। বড় আকারের উদ্ধৃতিগুলো মূল লেখা থেকে এক স্পেস নিচে থেকে এবং আধা ইঞ্চি ডান থেকে শুরু হয় বিধায় উদ্ধৃতিগুলো পূর্ণ পৃষ্ঠা দখল না করলে সেগুলো দেখতে ভালো লাগে। কোনো উদ্ধৃতি যদি পূর্ণ এক পৃষ্ঠা বা তার থেকে বেশি হয় তবে সেটি পাঠের সময় পাঠক মূল লেখা পড়ছেন না উদ্ধৃতি পড়ছেন তা ঠাওর করে উঠতে পারেন না। আবার অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু কথা থেকে যায় যা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এতে উদ্ধৃতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। কারণ উদ্ধৃতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো মূল বিষয়ের স্বপক্ষে সমর্থন প্রদান করা এবং বক্তব্য ও যুক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই বৃহৎ উদ্ধৃতির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কোনো বক্তব্য থাকলে তা মূল বক্তব্যের সমর্থন প্রদান তো করেই না, বরং লেখা তার প্রাঞ্জলতা হারায়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি প্রদান করার রীতি প্রচলিত আছে :

(১) প্রশাসনিক নির্দেশ সরাসরি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ;
(২) আইনের বক্তব্যসমূহ সরাসরি উপস্থাপনের সময় ;
(৩) গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ;
(৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ সূত্রসমূহ উল্লেখ করার সময় ;
(৫) অন্য কোনো লোকের দেওয়া বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ;
(৬) কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা উপস্থাপনের সময়।

উদ্ধৃতির অংশসমূহ ছাপবার সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাক্ষরে বা কিঞ্চিৎ বাঁকা করে ছাপানোর রীতি প্রচলিত আছে। মূল বক্তব্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় অথচ প্রাসঙ্গিক

বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা চলে এমন কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তা পাদটীকা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। উদ্ধৃতির পূর্ণ অংশ যদি লেখায় স্থান না পায় তাহলে উদ্ধৃতি শুরুর প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরও ছোট হাতের অক্ষর হবে। যেমন :

A revolution, in the word of Franz Schurmann and Orville Schell, '...is the sweeping away of an old order–an ancient political system, a traditional culture, an uncreative economy, a ruling class which only exploits, and a system of social organization which no longer satisfies men'.

আলোচনা, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি

উদ্ধৃতি যে শুধু লিখিত কোনো পুস্তক বা জার্নাল থেকেই সংগৃহীত হতে হবে তা নয় ; আলোচনা, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার থেকেও উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তিবিশেষের আলোচনায় উপস্থাপিত বক্তব্য থিসিসে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে প্রথমে তা লিখিতভাবে ঐ ব্যক্তির সামনে হাজির করতে হবে। ঐ বিশেষ ব্যক্তির অনুমোদনের পরই কেবল তা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হবে। বক্তৃতা থেকে সংগৃহীত বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণীয়। আলোচনা, বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকার যেখান থেকেই বক্তব্য সংগৃহীত হোক না কেন, তা উদ্ধৃতি আকারে থিসিসে বা গবেষণামূলক যে কোনো লেখায় উপস্থাপনকালে প্রত্যক্ষভাবে আলোচকের, বক্তার বা সাক্ষাৎকারদানকারীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

পরোক্ষ উদ্ধৃতি

কোনো বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধৃতি আকারে প্রকাশকালে তাঁর নিজস্ব শব্দসম্ভারের ব্যবহার ব্যতিরেকে গবেষক তাঁর নিজস্ব পছন্দ মতো শব্দ যোগে তা উপস্থাপন করতে পারেন। এ ধরনের উদ্ধৃতিকে পরোক্ষ উদ্ধৃতি বলা হয়। পরোক্ষ উদ্ধৃতিগুলোতে উদ্ধৃতির চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না ; কিন্তু লেখকের নাম স্বীকৃতি পায়। যেমন :

The development of any nation depends largely upon harmonious coexistence among various religious and ethnic groups and their congenial behavior patterns (Abul Barkat 1997).

উদ্ধৃতির উহ্য অংশ (Ellipses)

উদ্ধৃতির মূল অর্থের কোনো প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে উদ্ধৃতি-বাক্যের মধ্যকার এক বা একাধিক শব্দ উহ্য রাখার রীতি স্বীকৃত হয়েছে। অল্প ব্যবধানে তিনটি বিন্দু (...) ব্যবহার করে বোঝানো হয় যে, উদ্ধৃতিতে কিছু শব্দ উহ্য রাখা হয়েছে। উদ্ধৃতির যেখানেই উক্ত চিহ্ন (...) ব্যবহার করা হোক না কেন যে শব্দ বা শব্দাবলির পরিবর্তে তা ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণভাবেই বুঝে নিতে হবে যে, উক্ত শব্দ বা শব্দাবলি উদ্ধৃতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন :

Robert Nibs, for example, refers to the reorientation of social thought which gave rise to sociology as '... a reaction of traditionalism against analytical reason', and he sums up his view as follows : 'The paradox of sociology ... lies in the fact that although it falls, in its objectives and in the political and scientific values of its principal figures, in the mainstream of modernism, its essential concepts and its implicit perspectives place it much closer, generally speaking, to philosophical conservatism. Community, authority, tradition, the sacred : these are primary conservative preoccupation in the age ...'.

পাদটীকা (Footnote)

কোনো গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মের মধ্যকার কোনো বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বা পরিপূরক কোনো তথ্যের সন্ধান পেলে বা কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতের অংশবিশেষ ব্যবহার করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের পার্শ্বে একটু উপরে বিশেষ কোনো চিহ্ন বা সংখ্যা উল্লেখপূর্বক বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য থেকে তা পৃথক করার নিমিত্তে একই পৃষ্ঠার নিচে একটি দাগ দিয়ে (বর্তমানে Computer ব্যবহারের মাধ্যমে MS-Word এ উক্ত কাজটি অতি সহজে এবং সুন্দরভাবে করা যায়) উক্ত দাগের নিচে তা উল্লেখ করতে পারেন। প্রাসঙ্গিক বা পরিপূরক কোনো তথ্য উপস্থাপনের এহেন পদ্ধতিকে পাদটীকা বলে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে পাদটীকা ব্যবহৃত হয় :

১. গবেষকের কোনো লেখায় বিশেষ কোনো বক্তব্যের সমর্থনে দেয় নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা সূত্র (Reference) উল্লেখের ক্ষেত্রে।

২. বর্তমান গবেষণার বিষয়টির মূল বক্তব্যকে ব্যাহত না করে বরং যদি কোনো তথ্য বা বক্তব্য তার সমর্থন দান করে বা বক্তব্যকে পরিস্ফুটিত করে তবে সেক্ষেত্রে পাদটীকা প্রদান যথার্থ যুক্তিযুক্ত।

৩. Cross reference উল্লেখের ক্ষেত্রে।

৪. কোনো বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রয়োজন হলে।

আসল কথা হলো, যখন কোনো গবেষক মনে করেন যে, তাঁর লিখিত বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তোলার জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা দরকার এবং উক্ত বক্তব্য মূল বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে বক্তব্য পেশের স্বাভাবিক গতি ও প্রাণবন্ত ভাব ব্যাহত হবে, কেবল তখনই তিনি উক্ত বক্তব্য বা তথ্য পাদটীকা হিসেবে ব্যবহার করেন। গবেষণা কর্মের মূল বক্তব্যের যে সব স্থানে পাদটীকা সংক্রান্ত বক্তব্য সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় সেখানে তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করে বা কোনো সংখ্যা সহযোগে ক্রমিকানুসারে একই পৃষ্ঠার নিচে ক্ষুদ্রাক্ষরে অপর পৃষ্ঠার উদাহরণ অনুযায়ী তা উপস্থাপন করা হয় :

* The term "third world" is a 1990s invention by French intellectuals who wanted a new phrase that could be conveniently used to amass all underdeveloped countries, with their problems of hunger, poverty, and disease under one name.

অথবা

1 Chowdhury, P. B. (1993). *Enemy (vested) Property Ordinance : A Tyranny to the Minorities of Bangladesh* (Communal Discrimination in Bangladesh : Facts and documents), Dhaka : Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council.

2 Barkat, Abul., S. Zaman, A. Rahman, and A. Poddar. (1996). *Impact of Vested Property Act on Rural Bangladesh : An Exploratory Study*, Dhaka : Association for Land Reform and Development and University Research Corporation (Bangladesh), ISBN 984-8175-03-2.

3 Rahman, M. F. "Vested Property Act", Dhaka : The Daily *Sangbad*. 17.05.93 and 18.05.93.

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম প্রথমে আনার রীতি প্রচলিত আছে। শেষ নাম প্রথমে ব্যবহার করার পর একটি কমা (,) দিতে হবে এবং দেয় নাম ও মধ্য-প্রারম্ভিক ব্যবহার করতে হবে। নামের আগেকার Sir, Dr., Professor ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। নামের অব্যবহিত পরই গ্রন্থের বা প্রকাশনার প্রকাশকাল এবং এর পর পুস্তকের বা প্রকাশনার শিরোনাম বাঁকা অক্ষরে (আজকাল Computer ব্যবহারের মাধ্যমে MS-Word-এ অতি সহজেই বাঁকা অক্ষরে লেখা সম্ভব) লিখতে হবে। শিরোনাম লেখার শেষে দাড়ি বা Full stop দিতে হবে। তারপর প্রকাশনার স্থান লিখে কোলন (:) দিয়ে প্রকাশকের নাম লিখতে হবে এবং সবশেষে দাড়ি বা Full stop ব্যবহার করতে হবে। প্রকাশনার সময়কাল একেবারে শেষে লেখার রীতিও প্রচলিত আছে। গ্রন্থপঞ্জি লিপিবদ্ধকরণের যে প্রক্রিয়ার কথা বর্ণনা করা হলো তা নিচে উদাহরণের সাহায্যে আরো সুস্পষ্ট করা হলো :

পুস্তক ও গবেষণা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে

Burzun, Jacques and Graff, Henry 1957. *The Modern Researcher*, New York : Brace and Company.

Beveridge, W. I. 1950. *Scientific Investigation*, New York : Vintage Books.

Barkat, A. 1994. "Transforming Human Deprivation into Human Development in Bangladesh : GO-NGO Dimensions", in *Asian Profile*, Volume 22, No. 4, Asian Research Service, Hong Kong.

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে

Janokantha 1995. Weavers at Stake, April 21, Dhaka.

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৯৭। সম্পাদকীয়, এপ্রিল ২৫, ঢাকা।

Bangladesh Observer 1996. P. 3, Col. 4, August 22, Dhaka.

থিসিস ও ডিসারটেশনের ক্ষেত্রে

Ahmed, M. U. 1989. *Economic and Statistical Analysis of People's Living* Standard in Bangladesh. Unpublished Ph. D. thesis, Odessa University of National Economy, Odessa, Ukraine.

Khan, S. S. 1978. *Banking on Women : Learning, literacy and human development in the Grameen Bank, Bangladesh.* Unpublished Ph. D. thesis, University of California, Berkley, USA.

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়
STAGES OF SOCIAL RESEARCH

সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করতে হলে সমাজ গবেষককে গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। এই পর্যায়সমূহের মধ্যে পরস্পর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং একটি পর্যায়ের উপর অপরটি দারুণভাবে নির্ভরশীল। তাই কোনো পর্যায়কেই হালকাভাবে দেখলে চলবে না। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়েরই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত চাহিদা লক্ষ্য করা যায় যা যথাযথভাবে পূরণের মাধ্যমে একটি সার্থক গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা সম্ভব।

গবেষণার পর্যায়সমূহ পরস্পরের সাথে এমন নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ যে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি পরবর্তী পর্যায়ের উপর দারুণভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই পূর্ব থেকেই প্রত্যেক পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী গুরুত্ব প্রদান করা দরকার এবং পরবর্তী পর্যায়ের চাহিদা সম্পর্কে পূর্ববর্তী পর্যায়ে অবস্থানকালেই জ্ঞাত থাকতে হবে। এভাবে গবেষণা কাজে ভুল-ত্রুটির মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব।

সামাজিক গবেষণা কর্মে প্রধানত নিম্নের পর্যায়গুলো লক্ষ্য করা যায় :

* গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন (Selecting the research problem)
* প্রকল্পন গঠন (Framing of hypothesis)
* গবেষণা নকশা তৈরিকরণ (Making research design)
* প্রশ্নমালা প্রণয়ন (Framing of questionnaire)
* তথ্য সংগ্রহকরণ (Collection of data)
* তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ (Processing and analysis of data)
* সাধারণীকরণ (Generalization)
* ফলাফলের তাৎপর্য নিরূপণ (Estimating the significance of result)

সামাজিক গবেষণার পর্যায়সমূহ

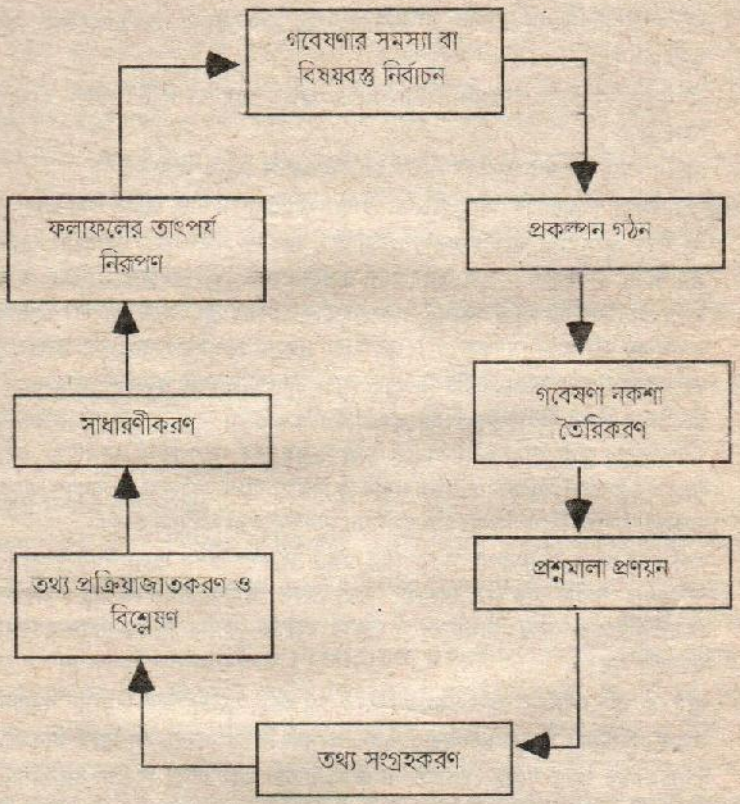

উপরিউক্ত বৃত্ত-চিত্রে গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। এই আটটি পর্যায়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড একজন গবেষক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারলে তিনি তাঁর গবেষণা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন বলে আশা করা যায়।

গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন

সমাজ গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে সর্বাগ্রে এই বৃত্ত-চিত্রের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করেন। গবেষণার এই প্রথম পর্যায়ে গবেষকের কাজ হলো গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ বা বিষয়বস্তু নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে গবেষককে সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে-বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় না তা গবেষণার বিষয় বা সমস্যা হতে পারে না। তাই

গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা দরকার :

* ইতিপূর্বে পরিচালিত গবেষণা পর্যালোচনা করে তার কোনো ঘাটতি বা ফাঁক বের করা যায় কিনা ;
* একই সমস্যা নিয়ে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন রকম হয়েছে কিনা ;
* কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য বা সঠিক জ্ঞানের অভাব আছে কিনা।

গবেষণার সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহের বর্ণনা নিচে প্রদান করা হলো :

১. যে বিষয় বা সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে তা সঠিকভাবে সম্পাদিত হলে তার দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হবে কিনা সে বিষয়টির প্রতি প্রথমেই গবেষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। যদি কোনো গবেষণার ফলাফল তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় তবে সে ধরনের গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের পেছনে কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

২. গবেষণার বিষয় নির্বাচনের দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো নির্বাচিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে কিনা এবং উক্ত তথ্য সংগ্রহের কাজটি সহজসাধ্য কিনা। যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে তা বাদ দিয়ে নতুন কোনো সমস্যা নির্বাচন করা সমীচীন হবে।

৩. গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর একটা বিবেচ্য বিষয় হলো সময় ও অর্থ। গবেষণার পরিধি বিস্তৃতি বিশাল হলে তাতে অধিক সময় ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। সময় ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো বিষয় নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

৪. গবেষক যদি নবীন বা অনভিজ্ঞ হন তবে সেক্ষেত্রে সহজ-সরল সমস্যা নির্বাচন করাই সমীচীন। সমাজ গবেষণায় এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সুতরাং গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষককে স্বীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দিকটি তাঁর বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫. গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি গবেষককে কোনো বিশেষ এলাকায় জরিপ চালানোর দরকার হয় তবে সে এলাকাটি গবেষকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হবে কিনা তাও পূর্ব থেকেই গবেষকের বিবেচনায় আনা দরকার।

প্রকল্পন গঠন

সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পন গঠন খুবই জরুরি একটি বিষয়। এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের পর এবং প্রাসঙ্গিক বইপত্র ও সাময়িকী যথাযথভাবে অধ্যয়ন শেষে গবেষককে উক্ত বিষয়ে প্রকল্পন গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হয়। গবেষণার এই পর্যায়ে প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীকেই গবেষণার উপযোগী এক বা একাধিক অনুমান ধরে নিতে হয়। এ পর্যায়ে গবেষক তাঁর স্বীয় বিষয়

সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং নিজের অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে এক বা একাধিক অস্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এভাবে গৃহীত অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে প্রকল্পন বলে। পরবর্তী কালে বাস্তবে কাজ করে স্বীয় বিষয়ে গৃহীত অস্থায়ী সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর অস্থায়ী সিদ্ধান্তের সাথে মিলিয়ে দেখেন। অনেক সময় তার পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়; আবার অনেক সময় তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

প্রকল্পন গঠনের সময় এতে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানে বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে উক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন : সমতল ভূমিতে বসবাসকারীদের তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ গ্রহণ প্রবণতার প্রধান কারণ নিম্নহারের বেতন স্কেল, বাংলাদেশে উচ্চ শিশুমৃত্যু হারের প্রধান কারণ মায়ের পুষ্টিহীনতা, বাংলাদেশে বর্তমানে পাটের নিম্নফলনের প্রধান কারণ হলো পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি।

একজন গবেষকের কাছে প্রকল্পন গঠন অপেক্ষা গৃহীত প্রকল্পনের যাচাই-বাছাই-এর মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাই বেশি জরুরি।

গবেষণা নকশা তৈরিকরণ

গবেষণা নকশা হলো সমীক্ষার পরিকল্পনা। একটি আদর্শ গবেষণা নকশা কাম্য গবেষণা পদ্ধতি নির্দেশ করে। "Research design is the plan, structure and strategy of investigation conceived so as to obtain answers to research questions and control variance" (Karlinger, 1978). কাজ শুরু করার আগেই গবেষণা নকশা ঐ কাজের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করে। যখন কোনো গবেষক পিএইচ. ডি. বা এম. ফিল. পর্যায়ে গবেষণা করার জন্য প্রথমে Research proposal বা গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দেন সেখানে প্রকৃতপক্ষে এ গবেষণার নকশাটিই ফুটে ওঠে। গবেষণা নকশায় গবেষক তাঁর প্রাপ্ত সম্পদ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে চান তার একটি নীল-নকশা প্রণয়ন করেন। সাধারণত গবেষণা নকশায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে :

* কোন বিশেষ পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে;
* কোন কোন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
* কি পদ্ধতিতে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হবে;
* সংগৃহীত তথ্য কিভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

সবশেষে স্মরণ রাখা দরকার যে, গবেষণা নকশা অপরিবর্তনীয় বা অনমনীয় কোনো পূর্বপরিকল্পনা নয়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন অবশ্যই আনা যায়। কিন্তু অনেক সময় বার বার গবেষণা নকশার পরিবর্তন গবেষকের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (গবেষণা নকশা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।)

প্রশ্নমালা প্রণয়ন

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করার স্বার্থে গবেষক প্রশ্নমালা প্রণয়ন করেন। প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গবেষণার দুটি বৃহৎ কর্ম পাশাপাশি সম্পাদিত হয়। এর একটি হলো গবেষণার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কি কি প্রশ্ন উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সে সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে সাদৃশ্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াটি সুবিন্যস্ত আকারে সম্পাদিত হয়। অপরটি হলো প্রতিজন উত্তরদাতা বা প্রতিটি একক হতে যে উত্তর পাওয়া যায় তা সুশৃঙ্খলভাবে প্রশ্নমালায় লিপিবদ্ধকরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়।

একটি যথার্থ প্রশ্নমালা তৈরির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া প্রয়োজন :

* তথ্যের উৎস সুনির্দিষ্ট করতে হবে ;
* কি কি তথ্য খুঁজতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে ;
* কোন শ্রেণীর প্রশ্নমালা ব্যবহার করতে হবে ;
* প্রথমে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে ;
* প্রশ্নমালাটির পুনঃনিরীক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে ;
* প্রশ্নমালাটির পূর্ব-নিরীক্ষা করতে হবে ;
* সম্পাদিত প্রশ্নমালার ব্যবহারিক প্রক্রিয়াগুলো নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্নমালা তৈরির সময় গবেষককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়, যাতে কোনো প্রয়োজনীয় প্রশ্ন প্রশ্নমালা থেকে বাদ না পড়ে। প্রশ্নমালার ভাষা সহজ-সরল হতে হবে যাতে উত্তরদাতার পক্ষে অতি সহজেই প্রশ্ন বুঝে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। প্রশ্নমালায় এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যা বিষয়বস্তু অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিকল্প অর্থ প্রকাশ করে। একটি প্রশ্নমালা নমুনা হিসেবে পরিশিষ্ট ক-তে সংযোজন করা হলো।

তথ্য সংগ্রহকরণ

সমাজ গবেষণায় মানুষের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার ফলাফলই উপাত্ত। অন্যভাবে বলা যায় প্রশ্নমালার প্রয়োগে মানুষের আচরণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তাকেই উপাত্ত বলে। উপাত্ত দুটি উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে। যথা :

* প্রাথমিক উৎস (Primary source),
* গৌণ উৎস (Secondary source)।

সাক্ষাৎকারমালা বা প্রশ্নমালা ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরিভাবে নমুনা সংগৃহীত হয় এবং সংগৃহীত নমুনা থেকে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তাকে Primary data বা প্রাথমিক উপাত্ত বলে। বই-পত্র, সাময়িকী, সরকারি প্রকাশনা, জরিপ, ঐতিহাসিক দলিল-পত্র, গবেষণার প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত উপাত্তকে Secondary data বা গৌণ উপাত্ত বলে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ পুস্তকের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে করা রয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য সমাজ গবেষণায় যে-সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে সাক্ষাৎকারমালা ও প্রশ্নমালা পদ্ধতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য সংগ্রহের কাজ সমাপনের পরই তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজটি শুরু হয়। এর পর শুরু হয় তথ্য বিশ্লেষণের কাজ। এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্য বিশ্লেষণের কাজকে সহজতর করার স্বার্থে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এমনভাবে সম্পাদন করা উচিত যাতে অতি সহজেই কাঙ্ক্ষিত উপাত্ত লাভ করা যায়।

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পর্যায়সমূহ অনুসরণ করা হয় :

* প্রশ্নমালা সম্পাদন (Field editing)
* তথ্যের সংকেতায়ন ও সম্পাদন (Coding and editing)
* শ্রেণীকরণ (Classification)
* সারণিবদ্ধকরণ (Tabulation)
* পরিসংখ্যানিক গুরুত্ব যাচাই (Statistical test of significance)

বর্তমানে কমপিউটারের সাহায্যে SPSS (Statistical Package for Social Science) Software ব্যবহার করে অতি সহজেই চমৎকারভাবে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করা যায়। এতে অল্প সময়ে অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের কাজগুলো করা সম্ভব। তাই বর্তমানে SPSS Software-টি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নিচে SPSS Software ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের যে সমস্ত কাজ করা যায় তার মধ্যকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ Operation গুলো উল্লেখ করা হলো :

* Computing Values
* Counting Occurrences
* Ranking Data
* Sorting Data
* Examining Data
* Summarizing Data
* Data Tabulation
* Creating Charts
* Testing Hypothesis
* Analysis of Variance
* Correlation Analysis
* Regression Analysis
* Curve Estimation
* Nonparametric Tests
* Listing Cases
* Reporting Results

সাধারণীকরণ

গবেষণার এ পর্যায়ে নমুনা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় তাকে পূর্বে গৃহীত প্রকল্পনের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক এ পর্যায়ে একটি সাধারণ উক্তিতে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এখানে তিনি অল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি অনুমান প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার নির্দিষ্ট একটি অংশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল যে, তাঁদের সবাই এন.জি.ও. দ্বারা বাংলাদেশ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করেন। এখান থেকে গবেষক যদি এমন একটি সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'বাংলাদেশের সব লোকই বাংলাদেশ এন. জি. ও দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করে' তবে এটাই হবে সাধারণীকরণ।

সাধারণীকরণ কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই সামাজিক গবেষণার সব থেকে কঠিন কাজ যেখানে গবেষককে অত্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানে সফল সাধারণীকরণের দৃষ্টান্ত খুবই কম।

ফলাফলের তাৎপর্য নিরূপণ

গবেষণার শুরু থেকে শেষ অবধি মোট ৮টি পর্যায় সম্পাদন করেই গবেষক ক্ষান্ত হতে পারেন; কিন্তু গবেষণা এখানেই থেমে থাকে না। গবেষক তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে ব্যর্থ হলে বা আংশিকভাবে সফল ফলাফল লাভ করলে বা গবেষণার ফলাফল গবেষণার বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ব্যাপক ধারণা দিতে অসমর্থ হলে গবেষক প্রথম পর্যায় থেকে আবার নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করেন এবং পূর্বের ভুল-ত্রুটি দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে গবেষক এ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের তাৎপর্য নিরূপণের বিষয়ে কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে গবেষক প্রয়োজনানুসারে নতুনভাবে প্রকল্পন গঠন করতে পারেন।

গবেষণা সফল হওয়া সত্ত্বেও গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ হতে গবেষক তাঁর অনুমান পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে, গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে নমুনায়নের অপ্রতুলতার ত্রুটি ধরা পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে গবেষক আবার প্রথম পর্যায় থেকে গবেষণা পরিচালনা করেন। সমাজবিজ্ঞানের একটি গবেষণা আর একটি বা একাধিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করে। এভাবে একই বিষয়ের উপর বহুসংখ্যক গবেষণাকর্ম সম্পাদন হওয়ার ফলে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে পৌঁছে। আবার অনেক সময় এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, একই বিষয়ের উপর গবেষণার ফলাফল জনগোষ্ঠীভেদে বা এলাকাভেদে ভিন্নতর হয়। তাই একই বিষয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর বা বিভিন্ন এলাকার উপর গবেষণা পরিচালিত হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই উক্ত গবেষণা উল্লিখিত ৮টি পর্যায় অনুযায়ী সম্পাদিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ গবেষণায় রেটিং স্কেলের ব্যবহার
USE OF RATING SCALE IN SOCIAL RESEARCH

রেটিং পদ্ধতি অনুক্রমিক ব্যবধান (Successive interval) পরিমাপ পদ্ধতিসমূহের একটি। যে-সব মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ পদ্ধতি বিচার (Judgment)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে রেটিং স্কেল সবার শীর্ষে। প্রকৃতপক্ষে রেটিং পদ্ধতিকে অনুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (Method of successive categories) বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যবধান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতিতে কয়েকটি উদ্দীপককে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং উক্ত শ্রেণীগুলো একটি নির্দিষ্ট পরিসরে পরিমাণগত পার্থক্য নির্দেশ করে। উদ্দীপকের শ্রেণীসমূহকে পরস্পর সমান হতেই হবে এমন নয়। তবে এ পদ্ধতিতে শ্রেণীসমূহকে একটি সঠিক অনুক্রমে সাজাতে হয়, প্রত্যেকটিকে একটি মূল্যমান বা সংখ্যা প্রদান করতে হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সীমারেখা নির্দিষ্ট করতে হয়। এর ফলে সংখ্যাসমূহ অতি সহজেই শ্রেণীসমূহের মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য প্রদর্শন করে।

প্রকৃতপক্ষে ফলিত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই রেটিং স্কেলসমূহ সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে সামাজিক গবেষণায় বিশেষ করে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, কোনো বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব, ব্যক্তিত্বের গুণাবলি, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য রেটিং স্কেলের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। রেটিং স্কেলের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পেছনে প্রধান কারণ হলো এর সহজবোধ্যতা এবং এটি তৈরি ও ব্যবহারের সহজসাধ্যতা।

রেটিং স্কেলের বিভিন্ন ধরন

রেটিং স্কেলসমূহকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সংখ্যাভিত্তিক (Numerical)
২. রৈখিক (Graphic)
৩. স্ট্যান্ডার্ড (Standard)
৪. ক্রম সমষ্টিমূলক (Cumulated points)
৫. বাধ্যতামূলক নির্বাচন (Forced choice)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, রেটিং স্কেলসমূহের এ শ্রেণীবিভাগ শিথিলযোগ্য। কারণ, সর্বত্র একই সূত্রানুসারে শ্রেণীর নামকরণ করা হয় নি। তবে এদের মধ্যে সাদৃশ্য হলো এই যে, এদের উদ্দেশ্য একই।

সংখ্যাভিত্তিক স্কেলসমূহ

সংখ্যাভিত্তিক স্কেলে গবেষক পর্যবেক্ষককে সুনির্দিষ্ট অনুক্রমণের কতকগুলো সংখ্যা প্রদান করেন যার প্রতিটির একটি করে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। এভাবে যতটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে ততটি সংখ্যা এবং প্রতিটি সংখ্যার একটি করে সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। গিলফোর্ড (১৯৭১) কোন রং মানুষের মনে কতটুকু আবেগ সৃষ্টি করতে পারে তা পরিমাপ করার জন্য নিম্নলিখিতভাবে একটি সংখ্যাভিত্তিক রেটিং স্কেল তৈরি করেন :

১০. চরম আনন্দদায়ক বা অকল্পনীয়
৯. খুব বেশি আনন্দদায়ক
৮. অত্যন্ত আনন্দদায়ক
৭. মোটামুটি আনন্দদায়ক
৬. মৃদু আনন্দদায়ক
৫. কিছুটা পীড়াদায়ক
৪. মোটামুটি পীড়াদায়ক
৩. বেশি পীড়াদায়ক
২. খুব বেশি পীড়াদায়ক
১. পরম পীড়াদায়ক যা কল্পনা করা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক পর্যবেক্ষককে সংখ্যা না দিয়ে শুধু বর্ণনামূলক শ্রেণী সরবরাহ করে থাকেন। পর্যবেক্ষকের অবস্থা জানার পর গবেষক উক্ত বর্ণনাসমূহে সংখ্যা প্রদান করেন। বর্ণনাসমূহের বিপরীতে সংখ্যা প্রদানের ফলে গবেষকের পক্ষে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যটি সহজতর হয়। বর্তমানে উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কমপিউটারের SPSS Software ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক। বর্ণনামূলক শ্রেণীসমূহের বিপরীতে সংখ্যা বসিয়ে SPSS-এ Data Entry করার সময় Labels দিলে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা খুবই সহজ ও প্রাণবন্ত হয়।

নিচে সংখ্যাভিত্তিক স্কেলের আর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলো।

একটি শহরের কিছুসংখ্যক লোককে পর্যবেক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত শহরে বসবাস করতে তাদের কেমন লাগে এ সম্পর্কে বর্ণনামূলক শ্রেণী সরবরাহ করে 'রেট' করতে বলা হলো।

সরবরাহকৃত বর্ণনামূলক শ্রেণীসমূহ নিম্নরূপ :

খুব বেশি ভালো, খুব ভালো , ভালো, মোটামুটি, খারাপ, খুব খারাপ, খুব বেশি খারাপ। পর্যবেক্ষকগণ কর্তৃক রেটিং করার পর গবেষক প্রত্যেক শ্রেণীর বিপরীতে সংখ্যামান আরোপ করলে শ্রেণীসমূহের অবস্থা নিম্নরূপ :

খুব বেশি ভালো	(৭)
খুব ভালো	(৬)
ভালো	(৫)
মোটামুটি	(৪)

খারাপ	(৩)
খুব খারাপ	(২)
খুব বেশি খারাপ	(১)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সংখ্যাভিত্তিক স্কেলসমূহে যতগুলো বর্ণনামূলক শ্রেণী ব্যবহার করা হয় স্কেলটিকে তত পয়েন্টের স্কেল বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আগের উদাহরণটি ১০ পয়েন্টের স্কেল এবং পরের উদাহরণটি ৭ পয়েন্টের স্কেল।

রৈখিক স্কেল

রেটিং স্কেলসমূহের মধ্যে রৈখিক স্কেল সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। রৈখিক স্কেলের ক্ষেত্রে স্কেলের প্রান্ত দুটিকে সরলরেখা সহযোগে সংযুক্ত করে পর্যবেক্ষকের জন্য অনেক ধরনের সংকেত প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে রেখাটিকে কতকগুলো খণ্ডে বিভক্ত করা হয়, আবার অনেক সময় একটি নিরবচ্ছিন্ন রেখাও প্রদান করা হয়। বৈবাহিক জীবনের সম্পর্ক পরিমাপক একটি রৈখিক স্কেল উদাহরণস্বরূপ নিচে দেওয়া হলো [একই ধরনের একটি স্কেল ব্যবহার করেছেন সরকার, রহমান এবং হক (১৯৮১)] :

সবকিছু বিবেচনা করে বৈবাহিক জীবনে আপনি কতখানি সুখী?

খুব বেশি সুখী	যথেষ্ট সুখী	সুখি	মোটামুটি সুখী	অসুখী	বেশি অসুখী	চরম অসুখী
(৭)	(৬)	(৫)	(৪)	(৩)	(২)	(১)

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের আরও বিভিন্ন প্রকার রৈখিক স্কেল তৈরি করা সম্ভব।

স্ট্যান্ডার্ড স্কেলসমূহ

স্ট্যান্ডার্ড স্কেলসমূহে পর্যবেক্ষককে কতকগুলো উদ্দীপকের স্ট্যান্ডার্ড বা নমুনা প্রদান করা হয়। হাতের লেখার সৌন্দর্য বিচার এ ধরনের স্কেলের একটি উদাহরণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হাতের লেখার কতকগুলো নমুনা সংগৃহীত হয় এবং সমব্যবধান স্কেলে সেগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। পর্যবেক্ষকের সামনে এ ধরনের কিছুসংখ্যক নমুনা হাজির করত তার সাথে একটি নতুন লেখার 'রেট' করতে বলা হয়। অতঃপর পর্যবেক্ষক নমুনাগুলোর সাথে লেখাটিকে মিলিয়ে দেখেন এবং যে নমুনাটির সাথে লেখাটির সব থেকে বেশি মিল তিনি খুঁজে পান সে নমুনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সংখ্যামান প্রদান করেন। আর যদি কোনো নমুনার সাথেই হুবহু না মেলে তাহলে দুটি নমুনার মাঝামাঝি কোনো একটি সংখ্যা প্রদান করেন।

ক্রম সমষ্টিমূলক রেটিং

ক্রম সমষ্টিমূলক পদ্ধতিতে সাফল্যাংক বা সংখ্যামান প্রদানের রীতি প্রচলিত আছে। আসলে এই পদ্ধতি অনুসারে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যামান হলো কতকগুলো পয়েন্টের সমষ্টি বা গড়। এই পদ্ধতিকে মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সাথে তুলনা করা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক

অভীক্ষায় যেমন একজন ব্যক্তির সাফল্যাংক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতকগুলো প্রশ্নের নম্বর যোগ করা হয়, ঠিক তেমনটি ঘটে ক্রম সমষ্টিমূলক রেটিং পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। তবে এ দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ব্যক্তির নম্বরগুলো মানবিক বিচার থেকে পাওয়া যায় বিধায় ক্রম সমষ্টিমূলক রেটিং পদ্ধতির স্কেলসমূহের মধ্যে চেকলিস্ট (checklist) পদ্ধতিই সব থেকে বেশি মাত্রায় প্রচলিত পদ্ধতি। নিচে এ পদ্ধতির ধারণা একটি উদাহরণ সহযোগে পরিষ্কার করা হলো।

১৯২৯ সালে Hartshome এবং May শিশুদের চরিত্র পরিমাপ করার জন্য একটি চেকলিস্ট রেটিং পদ্ধতি সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। Hartshome এবং May ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করা যায় এমন বেশ কিছু সংখ্যক ভালো ও খারাপ বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা থেকে ৮০টি বৈশিষ্ট্যের নাম বেছে নেন।

যেমন :

সহযোগী	কটুভাষী
নিষ্ঠুর	বিনীত
চিন্তাশীল	অবিবেচক
নিঃস্বার্থ	উদাসীন
কর্তব্যপরাঙ্মুখ	মানবিক
দানশীল	লোভী ইত্যাদি।

একটি শিশু সম্পর্কে যে-সব গুণ প্রযোজ্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সেগুলোতে টিক চিহ্ন দেন। অতঃপর প্রত্যেক ভালো বৈশিষ্ট্যের জন্য +১ এবং প্রত্যেক খারাপ বৈশিষ্ট্যের জন্য –১ ধরে সেই হিসাবে সম্পূর্ণ গুণাবলিকে মূল্যায়ন করা হয়। সবগুলো মূল্যায়নের যোগফলই শিশুর প্রকৃত সাফল্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

উক্ত চেকলিস্ট পদ্ধতি কর্মচারী বা কর্মরত অন্য লোকদের কর্মসাফল্য বা অন্যান্য গুণ পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। রেটিং করার সময় শুধু স্মৃতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে যদি পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করা হয় তাহলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়। আবার একথাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি উক্ত পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক বৈশিষ্ট্যের নাম ব্যবহার করা হয় তাহলে পূর্বেই তাদের প্রত্যেকটির মূল্যমান পরীক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করে নেওয়া দরকার।

বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং

Travers (১৯৫১)-এর মতে বাধ্যতামূলক নির্বাচন রেটিং পদ্ধতিটি প্রথম উদ্ভাবন করেন Horst। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ইনভেন্টরি নির্মাণ করতে গিয়ে এবং পরবর্তীকালে রেটিং স্কেল তৈরি করতে গিয়ে Wherry সর্বপ্রথম পদ্ধতিটির সার্থক ব্যবহার করতে সক্ষম হন। আসলে কিন্তু এই পদ্ধতিটি সাম্প্রতিক কালের। এটি প্রধানত ব্যবহৃত হয় কর্মচারীদের মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে। উক্ত পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিশেষ সংলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে কি নেই, থাকলে কতটুকু আছে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, উপস্থাপিত দুটি

সংলক্ষণের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য। অন্যান্য রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই এই বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়।

রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতা এবং তা দূরীকরণের উপায়

রেটিং স্কেলের মূল স্বীকৃতি হলো মানুষ তার বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণযোগ্য যে, কোনো মানুষের বিচার-বিবেচনার উপর ভিত্তি করে অন্য কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন আশা করা যায় না। কারণ, মানুষ মানুষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বস্তু পরিমাপক যন্ত্রের মতো নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে অক্ষম। এ কারণেই রেটিং স্কেলের দুর্বলতার দিকগুলোর প্রতি এর ব্যবহারের সময় সজাগ থাকতে হবে। নিচে রেটিং স্কেলের প্রধান সীমাবদ্ধতার দিকগুলো নির্দেশ করা হলো :

* বদান্যতাপ্রসূত ভুল (Error of Leniency)
* কেন্দ্রীয় প্রবণতাপ্রসূত ভুল (Error of central tendency)
* পরিচিতি প্রভাব (Hallo effect)
* যৌক্তিক ভ্রান্তি (Logical error)
* বৈপরীত্যমূলক ভ্রান্তি (Contrast error)

বদান্যতাপ্রসূত ভ্রান্তি দু'ধরনের হতে পারে। এ দুটি হলো :

১. অতিমূল্যায়ন প্রবণতা,
২. অবমূল্যায়ন প্রবণতা।

এমন অনেক পর্যবেক্ষক আছেন যাঁদের মধ্যে অতিমূল্যায়ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বেশি নম্বর দিয়ে বসেন। ফলে তাঁর মূল্যায়নে ব্যক্তির সাফল্যাংক অতি উচ্চ হয়। আবার অনেক পর্যবেক্ষকের মধ্যে অবমূল্যায়ন প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি আবার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কম নম্বর দিয়ে থাকেন। ফলে তাঁর মূল্যায়নে ব্যক্তির সাফল্যাংক অতি নিম্ন হয়। তবে অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মধ্যে অতিমূল্যায়ন প্রবণতা দেখা যায়।

এসব সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ করে থাকেন এবং রেটিং স্কেল ব্যবহারের সময় সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দেন। রেটিং স্কেল স্থায়ী ভুল প্রতিরোধ করার উপায় হিসেবে তাঁরা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা কম দিয়ে এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা বাড়িয়ে সূক্ষ্মতর পার্থক্য নির্ণয়ের সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। কেন্দ্রীয় প্রবণতাপ্রসূত ভুল দূরীকরণের উপায় হিসেবে তাঁরা স্কেলের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বর্ণনাসমূহের মধ্যে বেশি দূরত্ব তৈরি করার পরামর্শ দেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ প্রান্তের বর্ণনাগুলোকে আরও স্পষ্ট করে তোলার কথা তাঁরা বলেন যাতে ঐসব বর্ণনায় অর্থের পার্থক্য বেশি মাত্রায় বোধগম্য হতে পারে। পরিচিতি প্রভাব দূরীকরণের পরামর্শ হিসেবে তাঁরা পর্যবেক্ষকের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের কথা বলেন। তাঁরা আরও বলেন যে, পর্যবেক্ষক যাতে প্রাসঙ্গিক গুণাবলি দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেজন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া উচিত এবং বৈশিষ্ট্যের যথাযথ মূল্যায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণা নকশা
RESEARCH DESIGN

গবেষণা নকশা কী এবং কেন

যাবতীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় প্রশ্ন আকারে বর্ণিত একটি সমস্যা ব্যক্তকরণের মধ্য দিয়ে। আর সেই প্রশ্নের সঠিক ও যথার্থ উত্তর পাওয়ার লক্ষ্যে গবেষক কর্তৃক প্রণীত পূর্ব পরিকল্পনাই হলো গবেষণা নকশা। "A research design is the arrangement of condition for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure" (Claire Selltiz and others, 1962)। গবেষক তাঁর গবেষণার নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত গবেষণার পর্যায় বা ধাপগুলো নিজ নিয়ন্ত্রণে আনেন। তাই সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে নকশা প্রণয়নের কাজটি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

গবেষক যখন গবেষণার জন্য বিষয় নির্ধারণের কাজটি শেষ করেন, তারপর গবেষণা পরিচালনার জন্য কোন ধরনের তথ্য প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করেন, তখনই তাঁকে গবেষণা নকশা তৈরির কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। গবেষণা নকশা প্রাপ্ত সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষককে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবেষণা পরিচালনার ব্যাপারে একটি কর্মসূচি উপহার দেয়। গবেষণা নকশা অনুসরণের মাধ্যমে গবেষক তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সঠিক ও যথার্থ পদ্ধতি ব্যবহার করত তথ্য সংগ্রহকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণের কাজগুলো ঠিকভাবে ও সময়মতো সম্পাদন করতে পারেন। গবেষণা নকশা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যক্ত করে (Kothari, 1994) :

১. What is the study about?
(গবেষণার বিষয় কি?)

২. Why is the study being made?
(গবেষণা কেন করা হচ্ছে?)

৩. Where will the study be carried out?
(গবেষণা কোথায় করা হবে?)

৪. What type of data is required?
(কি ধরনের উপাত্ত প্রয়োজন?)

৫. Where can the required data be found?
(কোথায় প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া যাবে?)

৬. What periods of time will the study include?
(কোন কোন সময়কাল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে?)

৭. What will be the sample design?
(নমুনা নকশা কি প্রকার হবে?)

৮. What techniques of data collection will be used?
(উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কি কি কৌশল ব্যবহার করা হবে?)

৯. How will the data be analyzed?
(তথ্য বা উপাত্ত কিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে?)

১০. In what style will the report be prepared?
(প্রতিবেদন কিভাবে প্রস্তুত করা হবে?)

যে কোনো গবেষণার জন্য গবেষণা নকশা তৈরি করা একটা অত্যাবশ্যকীয় কাজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণার নকশা দেখেই বলা সম্ভব, গবেষণাটির মান কেমন হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জন করার জন্য এবং সুষ্ঠু ও সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা সম্পাদনের জন্য গবেষণা নকশা প্রণয়ন নিতান্তই অপরিহার্য।

সব গবেষণার উদ্দেশ্য এক হয় না। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার কারণে গবেষণা নকশার প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গবেষক কিভাবে অগ্রসর হবেন, কোন পর্যায়ে কি কাজ করবেন, গবেষণা নকশায় এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে স্থান পায়। বস্তুত গবেষণা নকশা গবেষকের প্রাপ্ত সম্পদ, সময় ও শ্রমকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে গবেষণাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। যেহেতু বিষয়টির সাথে গবেষণায় ব্যবহৃত অর্থ, সময় ও শ্রমের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও জড়িত, সেহেতু অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে গবেষণা নকশা প্রণয়ন করা দরকার।

গবেষণা নকশা অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় কোনো পরিকল্পনা নয়। বরং নমনীয়তাকে গবেষণা নকশার একটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যেতে পারে। যে-কোনো গবেষণার ক্ষেত্রেই প্রথমে যে নকশা প্রণয়ন করা হয়, বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ই তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন বা সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে বাস্তবতার নিরিখে গবেষণা নকশারও কমবেশি রদবদল করতে হয়।

পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নকশার বিষয়বস্তুসমূহ

একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নকশায় যে-বিষয়গুলো স্থান পায় নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান (Introduction to research problem)

যে কোনো ধরনের গবেষণা নকশাতেই নকশাকে প্রথমে গবেষণা বিষয়ের বা সমস্যার বিবরণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বর্তমানে গবেষক যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে চান, তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বা সে বিষয়ে গবেষণা করা যুক্তিযুক্ত কেন, উক্ত সমস্যা সমাধান

কেন বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ অংশে আলোকপাত করা হয়। গবেষকগণ সাধারণত এ অংশের শিরোনাম নিম্নলিখিত বিভিন্ন নামে দিয়ে থাকেন :

* ভূমিকা (Introduction)
* সমস্যা (The Problem)
* কেন এ গবেষণা (Why this Study)
* গবেষণার কাঠামো (Framework of the Study)

২. প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান (Working definition)

গবেষক তাঁর বর্তমান গবেষণায় যে সব প্রত্যয় ব্যবহার করবেন সেগুলোর জন্য তিনি অবশ্যই কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করবেন। একই প্রত্যয় বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করতে হয়। প্রত্যয়গুলো বর্তমান গবেষণায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নকশায় স্থান পায়। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকম ধারণা থাকতে পারে, যেমন : পরিবার, সংগঠন, আয়, ভূমিহীন, তৃতীয় বিশ্ব, অপরাধ, বেকার, উপজাতি ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রত্যয়গুলো হতে যদি আমরা 'ভূমিহীন' প্রত্যয়টি বেছে নিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে আমাদের মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো দানা বেঁধে ওঠে :

* যার কোনো জমি নেই সেই কি ভূমিহীন?
* যার শুধু বসতবাটি আছে কিন্তু অন্য কোনো জমি নেই সেই কি ভূমিহীন?
* যার বসতবাটিসহ সামান্য জমি আছে তাকে কি ভূমিহীনের মধ্যে ধরা হবে?
* যাদের জমির পরিমাণ ০.৫০ একরের নিচে শুধু তারাই কি ভূমিহীন?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো গবেষণায় যদি 'ভূমিহীন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়, তবে এর একটি কার্যকরী সংজ্ঞা অবশ্যই প্রদান করা দরকার যার মধ্য দিয়ে গবেষক 'ভূমিহীন' বলতে কাদেরকে বুঝাতে চান তার যথাযথ বর্ণনা প্রকাশ পাবে। গবেষক যদি গবেষণার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য কোনো Technical word ব্যবহার করে থাকেন, তবে তারও সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে।

৩. প্রকল্পন গঠন (Formulation of hypothesis)

গবেষক যদি তাঁর গবেষণাকর্ম কোনো বিশেষ প্রকল্পন যাচাই-বাছাই করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করেন, তবে উক্ত প্রকল্পন সুস্পষ্টভাবে গবেষণা নকশায় উল্লেখ করতে হবে। গবেষকের প্রকল্পন গঠনের উৎস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। (প্রকল্পন গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।)

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য (Research objectives)

কী কী উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষক তাঁর গবেষণা পরিচালনা করতে চান, তার বিশদ বর্ণনা গবেষণা নকশায় উল্লেখ করতে হবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কী কী বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন গবেষণা নকশায় তারও বিশদ বর্ণনা দিতে হবে।

ধরা যাক, একটি ইউনিয়ন পরিষদের পরিবারসমূহের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবার পরিকল্পনার ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ হতে পারে :

* পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা ;
* পরিবারসমূহের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান, জ্ঞানের উৎসসমূহ ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ;
* পরিবারসমূহের পরিবার পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ;

(ক) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের ধারণা,

(খ) পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা,

(গ) পরিবার সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা :

* সন্তান আকাঙ্ক্ষা
* পরিবারের আয়তন
* সন্তান লালন-পালন

(ঘ) ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব,

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা :

* এ পর্যন্ত কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে ;
* ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া, সুফল, অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা ;
* পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারে অসুবিধা দূরীকরণ বিষয়ে ব্যবহারকারীদের মতামত জানা।

৫. গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the study)

এখানে গবেষক যুক্তিসহকারে তাঁর গবেষণার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার দিকগুলো তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে গবেষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা প্রতিটি গবেষকেরই অন্যতম প্রধান কাজ। গবেষণা নকশায় এটি অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। যেমন : গবেষণাটি কি কোনো তাত্ত্বিক গবেষণা, না ব্যবহারিক, না বাস্তব কোনো সমস্যা সমাধানে এর প্রয়োগ আছে ইত্যাদি সম্পর্কে নকশার এ অংশে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে পারে। সাধারণভাবে গবেষণার যৌক্তিকতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে :

* গবেষণালব্ধ জ্ঞান জ্ঞানের বিস্তারে সহায়ক হয়,
* তাত্ত্বিক গবেষণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে,
* বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানে এর প্রয়োগ থাকতে পারে,
* উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে,
* কোনো কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে।

BARDOC Library

উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা যেটির সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষক যুক্তি সহকারে তার প্রয়োজনীয়তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন গবেষণা নকশার এ অংশে। গবেষণা নকশায় এ ধরনের যৌক্তিকতার বর্ণনা অপরিহার্য আরও এ কারণে যে, সব ধরনের পাঠকের পক্ষে গবেষণার তাৎক্ষণিক অথবা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৬. তথ্যের উৎস (Sources of data)

গবেষণার উদ্দেশ্য সার্থক করার কাজে গবেষককে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। গবেষণার প্রয়োজনে তথ্যসমূহ কোথা থেকে সংগৃহীত হবে তা গবেষণা নকশায় বর্ণিত হয়। তথ্য বাস্তব ক্ষেত্র হতে সরাসরিভাবে সংগৃহীত হতে পারে আবার বই-পুস্তক, সরকারি দলিল, নথি-পত্র, প্রকাশিত জার্নাল, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি মাধ্যম থেকেও সংগৃহীত হতে পারে। আবার এমনও দেখা যায়, একটি গবেষণায় উভয় ধরনের উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তথ্য সংগ্রহের উৎস যেহেতু দু'ধরনের (Primary source and Secondary source) সেহেতু সংগৃহীত তথ্যসমূহকে তাদের উৎসের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

* প্রাথমিক তথ্য (Primary data)
* গৌণ বা মাধ্যমিক তথ্য (Secondary data)

(প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য সম্পর্কে আলোচনা এ পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং শুধু প্রাথমিক তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।)

৭. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Method of data collection)

গবেষণার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন : সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, কেস স্টাডি, বিষয়-সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং কেন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা গবেষণা নকশায় থাকে। অনেক সময় একই গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সে ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে কি ধরনের তথ্য সংগৃহীত হবে তা নকশায় উল্লেখ করতে হবে।

৮. তথ্যবিশ্ব বা সমগ্রক (Universe or population of the study)

তথ্য সংগ্রহের সময় সম্পূর্ণ সমগ্রক থেকে অথবা তার নমুনা থেকে তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। যে সমগ্রক থেকে তথ্য সংগৃহীত হবে সেই সমগ্রকের পরিষ্কার বর্ণনা গবেষণা নকশায় স্থান পাবে। আর যদি তথ্য সমগ্রকের নমুনা থেকে সংগৃহীত হয় তবে নমুনায়ন পদ্ধতি (Method of sampling), নমুনার আকার (Size of sample) ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে। কোন বিশেষ কারণে উক্ত নমুনায়ন পদ্ধতি এবং নমুনার বিশেষ আকার গৃহীত হয়েছে এ ক্ষেত্রে তার সপক্ষে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

৯. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা (Reliability and validity of data)

সার্থকভাবে গবেষণা সম্পাদনের প্রথম শর্ত হলো সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহকরণ। প্রকৃতপক্ষে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দ্বারা পরিচালিত গবেষণা থেকেই নির্ভরযোগ্য ফলাফল

লাভ করা সম্ভব। তাই গবেষককে প্রথম থেকেই সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী কী বাস্তব পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করবেন তার স্পষ্ট বর্ণনা গবেষণা নকশায় থাকতে হবে। সাধারণত নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে গবেষকগণ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন :

* প্রশ্নমালার পূর্বযাচাই (Pre-test)
* তথ্য সংগ্রহকালে তদারকি
* গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান
* সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ
* তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রেষণা (Motivation)
* অন্যদের সংগৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্যান্য তথ্যের সাথে সেগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পরও যদি অন্য কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে তবে তার বর্ণনাও নকশায় স্থান পাবে।

১০. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ (Processing and analysis of data)

সংগৃহীত তথ্য কোন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ করা হবে সে সম্পর্কে নকশায় বর্ণনা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ নকশার এ অংশে তথ্য বিশ্লেষণ পরিকল্পনা (Data analysis plan) স্থান পায়। তথ্য যদি প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকারমালা ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়, তাহলে সেই তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হতে পারে :

* Ranking Data
* Sorting Data
* Examining Data
* Summarizing Data
* Data Tabulation
* Graphical Representation of Data
* Analysis of Variance
* Test of Hypotheses
* Correlation Analysis
* Regression Analysis
* Nonparametric Tests

১১. সময়সূচি (Time schedule)

গবেষণা সংক্রান্ত সময়সূচি গবেষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহায়তা করে। তাই গবেষণা নকশায় গবেষণা সম্পাদন সংক্রান্ত সময়সূচি প্রদান

করা হয়। সময়সূচিতে বর্তমান গবেষণায় মোট কতদিন সময় লাগবে এবং মোট সময়কে ভাগ করে গবেষণার কোন কোন পর্যায়ে কত সময় ব্যবহার করা হবে ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা থাকে। অর্থাৎ গবেষণা নকশা প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র তৈরি, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি প্রভৃতি পর্যায়ে কত সময়ের প্রয়োজন হবে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে উক্ত সময়সূচির কমবেশি পরিবর্তন ঘটতে পারে।

১২. বাজেট (Budget)

বাজেট গবেষণা নকশার একটি অপরিহার্য অংশ। যে কোনো গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে সংগৃহীত হবে এবং সংগৃহীত অর্থ গবেষণার কোন পর্যায়ে কিভাবে ব্যয় করা হবে তা গবেষণা নকশায় বর্ণিত হয়। সুষ্ঠু বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থের যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা যথাসময়ে গবেষণা সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এর অন্যথা হলে অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা গবেষণা অসমাপ্ত থেকে যেতে পারে।

১৩. কর্মী (Personnel)

গবেষণার আয়তন বৃহৎ হলে একজন গবেষকের পক্ষে সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে কিরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি আবশ্যক হবে তার পরিকল্পনা গবেষণা নকশায় স্থান পায়। অর্থাৎ কতজন গবেষক, তথ্য সংগ্রহকারী, ফলাফল বিন্যাসকারী, তত্ত্বাবধায়ক, পরিসংখ্যানবিদ ইত্যাদি আবশ্যক তার বর্ণনা দেওয়া থাকে। প্রয়োজন হলে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গবেষক তাদের ট্রেনিং প্রদানের বিষয়টিও নকশায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৪. গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যনির্দেশিকা (Bibliography)

গবেষণা পরিচালনার জন্য সহায়ক বই-পুস্তক, অন্য গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তাই গবেষক তাঁর বর্তমান গবেষণায় যে সমস্ত সহায়ক বই-পুস্তকের প্রয়োজন হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে গবেষণা নকশায় অন্তর্ভুক্ত করেন। একেই বলা হয় গ্রন্থপঞ্জি। গ্রন্থপঞ্জি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হয় (এ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য সংগ্রহ : সাক্ষাৎকার
DATA COLLECTION : INTERVIEW

সাধারণভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মুখোমুখি অবস্থানে মৌখিক আলাপকে সাক্ষাৎকার বলে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

১. নির্বাচনমূলক সাক্ষাৎকার (Selection interview)
২. নিদানমূলক সাক্ষাৎকার (Diagnostic interview)
৩. গবেষণা সাক্ষাৎকার (Research interview)

এখানে শুধু আমরা গবেষণা সাক্ষাৎকার নিয়েই আলোচনা করব। সামাজিক গবেষণার সাক্ষাৎকারের সাথে দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য সাক্ষাৎকারের বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক গবেষণার সাক্ষাৎকারের বেলায় সংবাদ আদান-প্রদানের চেয়ে সংবাদ (তথ্য) সংগ্রহের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশি এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকে গবেষণার জন্য আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বলতে গবেষণা সংক্রান্ত বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত কথোপোকথনকেই বুঝানো হয়। এ ক্ষেত্রে গবেষক তাঁর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের বিষয় নির্ধারণ করে সাক্ষাৎকারদানকারীর সাথে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। নিচে সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. সাক্ষাৎকার প্রধানত মৌখিক কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার উপর নির্ভরশীল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব প্রশ্ন করা হয় এবং যে সব উত্তর দেওয়া হয় তার সবই প্রধানত মৌখিকভাবে হয়ে থাকে। তাই সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে বাচনিক পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা চলে।

২. সাক্ষাৎকার দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সামনাসামনিভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারী উভয়েই সশরীরে একই স্থানে উপস্থিত থেকে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন এবং এসময়ে একে অপরের চেহারা দেখতে পান। যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির সাথে সাথে টেলিভিশন সংযোগ ব্যবস্থার (TV Network) মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সাক্ষাৎকার দান পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের সাহায্যেও আজকাল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর থেকেও বড় বিষয় এই যে, বর্তমানে কম্পিউটার ইন্টারনেটের (Computer Internet) মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী যে কেবল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রশ্নসমূহের উত্তরই দিতে থাকেন তা নয়, সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ব্যক্তিত্ব, প্রশ্নের ধরন, তাঁর আচার-আচরণ, সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং এসব বিষয়ের প্রতিক্রিয়া তার উত্তরের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, সাক্ষাৎকার একটি পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক অংশ। সাক্ষাৎকারের এই বৈশিষ্ট্য নির্বাচনমূলক ও নিদানমূলক সাক্ষাৎকারের বেলায় সব থেকে বেশি কার্যকর।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য হতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সমাজ গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নমালার যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা ও পর্যবেক্ষণ এই তিনটি পদ্ধতির প্রতিটিরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের ধরন ও সহজলভ্যতার দিক বিচার করে এই পদ্ধতি তিনটির যে কোনো একটিকে (ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক) বেছে নেওয়া হয়। এমন অনেক তথ্য আছে যা সংগ্রহের জন্য তথ্যসংগ্রহকারীকে তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়। সে ক্ষেত্রে গবেষককে তথ্য সরবরাহকারীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজে বিশেষ জ্ঞান ও যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি খুব সাধারণ একটি ব্যাপার নয়। সাক্ষাৎকারের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল :

* সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য
* সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য
* সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু
* সাক্ষাৎকারের পরিবেশ

১. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণাবলি

সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব এবং সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা প্রধানত নির্ভর করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। বস্তুত এই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা একদিনে অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দীর্ঘ দিনের গভীর জ্ঞান। কারণ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর যদি সেই সমাজের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সেই সাক্ষাৎকার থেকে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। বস্তুত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অনেকগুলো গুণ থাকা দরকার যা সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এ সমস্ত গুণকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা চলে। যথা :

১. ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি (Subjective qualities)
২. বস্তুনিষ্ঠ গুণাবলি (Objective qualities)

ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি বলতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত গুণাবলি, যেমন ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব, প্রত্যুৎপন্নমতিতা, সহজ-সরল ব্যবহার, স্বাভাবিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বুঝায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রশ্ন করার কৌশল ও ধরন, বাচনভঙ্গি, অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ সাক্ষাৎকার থেকে ভালো ফলাফল লাভের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এসব গুণ ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাজের প্রতি স্বীয় মনোভাব ও আগ্রহ, পক্ষপাতহীনতা, বিষয়ের প্রতি স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি দারুণভাবে সাক্ষাৎকারের ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপর্যুক্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলি ছাড়াও কতকগুলো বস্তুনিষ্ঠ গুণাবলি থাকে যা সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, সামাজিক স্তর, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি তাঁর ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকারের উপর এহেন গুণাবলির প্রভাব তেমন আছে বলে মনে না হলেও বাস্তবে কিন্তু এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহিলাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একজন মহিলা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করলে যেমন ভালো ফল পাওয়া যাবে, একজন পুরুষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করলে কখনই তেমন ভালো ফল আশা করা যাবে না।

আসলে সাক্ষাৎকার একটি কলা, একটি দক্ষ পদ্ধতি যা ক্রমাগত অনুশীলন ও সাধনার দ্বারা উন্নততর ও অপেক্ষাকৃত সঠিক করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের সমন্বয় ঘটলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য অধিকতর পূর্ণাঙ্গ হয়।

২. সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর গুণাবলি

সাক্ষাৎকার একটি পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক আলাপ-আলোচনা। তাই সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরও যথেষ্ট ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিশেষ কিছু গুণ তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কোনো বিষয়ে মৌখিকভাবে আলাপ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা একটি বিশেষ গুণ। এ গুণের বলেই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট এবং যৌক্তিকভাবে তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হন। শিশু এবং মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা অশিক্ষিত লোকেরা যা চিন্তা করে তার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না বিধায় তারা সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য অনুপযোগী বিবেচ্য।

মানুষের মন সব থেকে জটিল উপাদানে গঠিত। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে এই উপাদানকে জয় করতে না পারলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নিকট থেকে প্রকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বের করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে সব সময় একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি সাক্ষাৎকার প্রদানকারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত হন, তবেই তাঁর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত হতে পারে, অন্যথায় নয়। সাক্ষাৎকার প্রদানের ব্যাপারে তাকে পীড়াপীড়ি করে রাজি করালে তাঁর দেওয়া তথ্য নির্ভরযোগ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ যাতে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করেন তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

* কেবল তাঁদের কাছ থেকেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা উচিত যাঁরা স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎকার প্রদানে ইচ্ছুক ;
* সাক্ষাৎকারের বিষয় ও বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে ভালোভাবে অবগত করাতে হবে ;
* সাক্ষাৎকার প্রদানকালে যে সময় ব্যয় হবে তার জন্য কিছু পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ;
* সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সুবিধামতো সময়ে ও সুবিধামতো স্থানে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়া দরকার।

৩. সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু

সাক্ষাৎকারের বিষয় সাক্ষাৎকারের ফলাফলের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণার এমন অনেক বিষয় আছে যার উপর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন বস্তুনিষ্ঠ সত্যের কাছাকাছি হওয়া তাঁর জন্য প্রকৃতপক্ষেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তিগত আয় বা বেতন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য কেউই অন্যকে জানাতে চান না। অর্থ সংক্রান্ত তথ্যকে মানুষ গোপনীয় বিষয় বলে মনে করে। আবার অনেক দেশের লোকেরা তাদের যৌনজীবন সম্পর্কে অন্যের সাথে আলাপ করতে চায় না। পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক দেশের মহিলারা মুখ খুলতে চায় না। তাই অনেক সময় এহেন ব্যক্তিগত বিষয়ে, বিশেষ করে আয়-ব্যয়, যৌনজীবন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফলের ব্যবহারিক মূল্য অনেক কম।

৪. সাক্ষাৎকারের পরিবেশ

অন্যান্য সব উপাদানের মতো সাক্ষাৎকার গ্রহণ বিষয়ে সাক্ষাৎকারের পরিবেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাক্ষাৎকারের পরিবেশের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। যথা :

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment),
২. সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ (Social and psychological environment)।

সাক্ষাৎকারের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে যে স্থানে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয় তার পরিবেশকে বুঝায়। সাক্ষাৎকার কক্ষের অবস্থান ও অবস্থা, বসার ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফ্যান ও লাইটের ব্যবস্থা ইত্যাদি সাক্ষাৎকারের প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ও বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ বলে।

সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব অর্পিত হয় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপর এবং এই দায়িত্ব কোন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কিভাবে পালন করবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের কক্ষটি আলোকময়, কোলাহলমুক্ত ও রুচিসম্মত হলে এবং বসার ব্যবস্থা থাকলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ অনানুষ্ঠানিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর অর্থ এই যে, সাক্ষাৎকার যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অফিসে সংঘটিত হয় তাহলে তিনি অবশ্যই নিজ চেয়ার ছেড়ে সাধারণ চেয়ারে বসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। এর ফলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের মানসিক পরিবেশই স্বাভাবিক থাকে।

সাক্ষাৎকারের ধরন (Types of Interview)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রক্রিয়াভেদে সাক্ষাৎকার দু'প্রকারের হতে পারে :

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Formal interview) এবং
২. অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Informal interview)।

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার

এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পূর্বনির্ধারিত বিশেষ কতকগুলো প্রশ্নের (Set of predetermined questions) উপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সামান্য নমনীয়তার সুযোগও প্রদান করা হয়। প্রয়োজনানুসারে তিনি সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, প্রশ্নের শব্দ পরিবর্তন করতে পারেন, এমন কি নতুন প্রশ্নও সংযোজন করার অধিকার রাখেন। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের সুবিধা হলো এই যে, এ ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা যায় এবং সব উত্তরদাতার কাছ থেকেই উত্তর পাওয়া গেছে কিনা তা সহজভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

২. অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার

এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পূর্বনির্ধারিত কোনো প্রকার প্রশ্নমালার সাহায্য ছাড়াই গবেষণার উদ্দেশ্যানুসারে ঘরোয়াভাবে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালার সীমারেখায় আবদ্ধ না করার কারণে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রেও এখানে তুলনামূলকভাবে পূর্বনির্ধারিত কৌশলের ব্যবহার কম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাঁকে খোলাখুলিভাবে উত্তরদানের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। উত্তরদাতাগণ সামাজিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক সময় উক্ত ঘটনাবলিকে তাঁদের নিজেদের মতো করেও সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। তবে একথা সত্য যে, সামাজিক গবেষণায় আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারই বেশি ব্যবহৃত হয়।

অনুসূচি (Schedule)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় অনুসূচি। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলিও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অনুসূচির প্রশ্নগুলোকে পর্যায়ক্রমে উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং প্রশ্নকারী স্বয়ং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রশ্নপত্রের নির্দেশিত স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। অনুসূচি প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যে উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত সে সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো একটিও যাতে অনুসূচি হতে বাদ না পড়ে অনুসূচি প্রণয়নকারীকে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (Interview Guide)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময় অনুসূচি (Schedule) ব্যবহৃত হয় না। অনুসূচির ব্যবহার দেখলে অনেক সময় উত্তরদাতাগণ প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তরদানের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন। অনুসূচির ব্যবহার ব্যতিরেকে শুধু পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে উত্তরদাতাগণ তুলনামূলকভাবে খোলামেলা আলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই অনুসূচি ছাড়াই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এমতাবস্থায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের সাহায্যে উত্তরদাতাগণকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এবং নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে 'সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা' সরবরাহ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সব তথ্যের প্রয়োজন তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সাক্ষাৎকার নির্দেশিকাতে প্রদান করা হয়। এই নির্দেশিকা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। প্রয়োজনবোধে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের ধরন, ভাষা ও শব্দ পরিবর্তন করতে পারেন।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

১. গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

২. উত্তরদাতা প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝে উত্তর দিচ্ছেন নাকি না বুঝেই উত্তর দিচ্ছেন সে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিশ্চিত হতে পারেন।

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে প্রশ্নকারী তুলনামূলক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন।

৪. সাক্ষাৎকারের পরিবেশের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৫. উত্তরদাতার ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখে একজন দক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অতি সহজেই অনুমান করতে পারেন উত্তরদাতা সঠিক উত্তর পরিবেশন করছেন কিনা।

৬. প্রশ্ন না বুঝলে প্রশ্নকারী বার বার তা বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।
৭. উত্তরদানের বিষয়ে উত্তরদাতাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

অসুবিধা

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ রয়েছে :

১. গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা অনেক সময় সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন।
২. মৌখিকভাবে পরিবেশিত উত্তরের যথার্থতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।
৩. সাক্ষাৎকার পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে গবেষণা করলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে বিভিন্ন রকমের ফল পাওয়া যায়।
৪. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংবেদনশীলতা, মেজাজ ও অন্যান্য মানসিক অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না, যা সাক্ষাৎকার দানকারীর উপর দারুণ প্রভাব ফেলে।
৫. গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করা হলে তাঁদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ধরন, উত্তর লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদিতে তারতম্যের কারণে সাক্ষাৎকারের ফলাফল দূষিত হতে পারে।
৬. সাক্ষাৎকার একটি বাচন পদ্ধতি বিধায় সব তথ্যই যথাসময়ে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয় না।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কিভাবে উন্নত করা সম্ভব

সাক্ষাৎকার সার্থকভাবে সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অতি সতর্কভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পরও এতে প্রচুর ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। কাজেই এই পদ্ধতি উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই দ্বিধা ও সংকোচে ভোগেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী চিন্তা করেন কি করে তিনি অপরিচিত ব্যক্তির সামনে খোলামেলাভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। অপরদিকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীও চিন্তান্বিত হন কীভাবে তিনি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। সমগ্র সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে সার্থক করতে হলে উভয়ের মধ্যকার দ্বিধা, সংকোচ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি কাটিয়ে উঠতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সাক্ষাৎকার দানকারীর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, পরিবেশিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করতে হবে এবং সরবরাহকৃত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল কি কাজে লাগবে তা বুঝিয়ে বলতে হবে। উভয়ের মধ্যে এহেন পরিবেশ ও সম্পর্ক সৃষ্টির উপরে সঠিক তথ্য সংগ্রহের নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাক্ষাৎকার পরিচালনা সংক্রান্ত কলাকৌশল আয়ত্তকরণের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাথে সহজে সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে নিচের আদর্শ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ (Standard checklist of interview session) গ্রহণ করলে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সফল করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় (Doby, 1954) :

* An interviewer generally should open an interview by asking factual non-threatening questions.
* The interviewer should locate the major data by unstructured "lead" question.
* The interview should make use of occasional guide questions.
* The interviewer should make an effort to pick up leads.
* The interviewer should cut through generalities with well formulated probes.
* The interviewer should stick with the fruitful areas with once they open up.
* The interviewer should reflect on the meaning of the emerging data and ask questions that clarify or amplify their meaning for the research problems.
* The interviewer should be specially alert to follow up only areas where the respondent shows emotional involvement.
* The interviewer should try to redirect the interview to more fruitful topics when useful data are not emerging.
* The interviewer should be alert to "touchy" subject matter.
* The interviewer should wind up the interview before the respondent becomes tired.

নবম অধ্যায়

তথ্য সংগ্রহ ও প্রশ্নমালা
DATA COLLECTION AND QUESTIONNAIRE

উত্তর পাওয়ার আশায় বিভিন্ন লোকের উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রশ্নের সমষ্টি বা তালিকাকে 'প্রশ্নমালা' বলে। বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে সমাজ গবেষণায় প্রশ্নমালার বহুলব্যবহার রয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা ডাকযোগে বা অন্য কোনো উপায়ে উত্তরদাতার নিকট পাঠানো হয়। উত্তরদাতা তা স্বয়ং পূরণপূর্বক গবেষকের নিকট ফেরত পাঠান। এটা এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে উত্তরদাতাকে পূর্বনির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বস্তুনিরপেক্ষ ও সংখ্যাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারীর কোনো প্রকার সাহায্য ছাড়াই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য

প্রশ্নমালার প্রধান দুটি উদ্দেশ্য আছে। যথা : বর্ণনা ও পরিমাপন। নিচে প্রশ্নমালার এ দুটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. বর্ণনা (Description)

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তা সমাজের কোনো না কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তথ্যসমূহ কোনো দল বা গোষ্ঠীর বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, পদমর্যাদা, আয়-ব্যয়, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যকার কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে। এহেন বর্ণনা গবেষককে গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

২. পরিমাপন (Measurement)

প্রশ্নমালা পদ্ধতির প্রধান ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরিমাপন। এর সাহায্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত চলকের মান পরিমাপ করা যায়। প্রশ্নমালা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সেগুলো বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোভাব পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংহতি, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি বা দলের মনোভাব পরিমাপ করার কাজে সামাজিক গবেষণায় প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Questionnaire)

১. প্রশ্নমালায় লেখার পরিমাণ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

২. প্রশ্নের সংখ্যা যথাসম্ভব কম থাকা বাঞ্ছনীয়। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে পরিহারযোগ্য। প্রশ্নমালার মধ্যে কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থাকলে বা প্রশ্নের পরিমাণ বেশি হলে তা উত্তরদাতার বিরক্তির কারণ ঘটাতে পারে।

৩. প্রশ্নগুলো এমন হওয়া দরকার যার মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যই সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. প্রশ্নগুলো সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে। দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এর থেকে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৫. এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর দেওয়া কোনো প্রকার পক্ষপাতদুষ্টতা (Bias) ছাড়াই সম্ভবপর হয়।

৬. প্রশ্নমালায় টেক্‌নিক্যাল শব্দাবলির (Technical words) প্রয়োগ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্নমালা যদি বিশেষ কোনো শ্রেণী বা বিশেষজ্ঞের বরাবর প্রেরণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল শব্দাবলি অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য।

৭. প্রাপ্ত উত্তরগুলোর সঠিকতা ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করার উপযোগী কিছু প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮. কৌশল বা ফাঁদ (Tricky) হিসেবে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলো পর পর ব্যবহার করা ঠিক নয়। অন্য প্রশ্ন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে যে সব প্রশ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলোও একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে ব্যবহার করা উচিত।

৯. যতদূর সম্ভব অধিক সংগঠিত প্রশ্ন (Structured question) দেওয়াই শ্রেয়। এতে উত্তরসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

১০. যে সব ক্ষেত্রে একটি বাক্য (হাঁ–না) ব্যবহার করে উত্তর প্রদান করা সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো সংগঠিত (Structured) করে দেওয়াই ভালো যাতে উত্তরদাতা মাত্র একটি টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করে উত্তর দিতে পারে। যেমন :

প্রশ্ন : আপনি কি নিজ জমির ধানেই সারা বছর চালান?

☐ হাঁ ☐ না

এহেন প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা হাঁ বা না–এর পূর্বের ঘরে টিক চিহ্ন ব্যবহার করে অতি সহজে সঠিকভাবে উত্তর প্রদান করতে পারেন। যে সব ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রশ্নের নিচের সম্ভাব্য উত্তরগুলো লিখে দিলে উত্তর প্রদান কাজ সহজ হয়, উত্তরসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয় এবং এরই ফলে তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সহজতর হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

☐ কৃষিকাজ

☐ চাকুরি

☐ ব্যবসা

☐ গৃহিণী

☐ ছাত্র

☐ বেকার

☐ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১১. সব প্রশ্নই বিশ্লেষণমূলক হওয়া দরকার। অর্থাৎ এগুলো অবশ্যই গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১২. প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে (Sequence) সাজাতে হবে। কোন প্রশ্নের পর কোন প্রশ্ন দিলে ভালো হবে তা অতি যত্নের সাথে বিচার করে দেখতে হবে।

১৩. উত্তরদাতা মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক এমন সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্নকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে হবে। উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক পরিপূরক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

১৪. সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বহুবিধ পছন্দ সম্বলিত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে রাখতে হবে।

১৫. প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ অতি সহজেই যাতে ছকবদ্ধ (Tabulation) করা যায় সে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রশ্নমালা ও অনুসূচি (Questionnaire and Schedule)

প্রশ্নমালা ও অনুসূচি উভয়ই বৃহৎ জনগোষ্ঠী হতে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। উভয়ই যথার্থভাবে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত বেশ কিছুসংখ্যক প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত। তাই অনেকেই প্রশ্নমালা ও অনুসূচিকে একই অর্থে ব্যবহার করে বসেন। বাস্তবে অনুসূচি ও প্রশ্নমালার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় তা নিচে তুলে ধরা হলো :

(ক) গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুসমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক প্রশ্ন যখন ডাকযোগে বা অন্য কোনো উপায়ে উত্তরদাতার নিকট প্রেরণ করা হয়, তখন সেই প্রশ্নসমূহকে প্রশ্নমালা নামে আখ্যায়িত করা হয়। উত্তরদাতা উক্ত প্রশ্নমালা স্বয়ং পূরণ করতে সংশ্লিষ্ট গবেষক বরাবর ফেরত পাঠান। অপরপক্ষে সুসমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক প্রশ্ন যখন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে অনুসূচি নামে আখ্যায়িত করা হয়। অনুসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নাবলি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিজে সাক্ষাৎকার দানকারীকে জিজ্ঞাসা করেন এবং সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীই অনুসূচির নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুসূচি ব্যবহৃত হয়।

(খ) প্রশ্নমালা ও অনুসূচি কাঠামোগত বিন্যাস এবং ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের দিক দিয়ে বেশ কিছুটা ভিন্নধর্মী হয়। যেহেতু উত্তরদাতা স্বয়ং প্রশ্নমালা পূরণ করেন এবং তখন গবেষকের পক্ষের কেউই উপস্থিত থাকেন না, সেহেতু ভাষা অধিকতর সহজ করে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। অপরপক্ষে অনুসূচির প্রশ্ন বার বার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

(গ) প্রশ্নমালা ডাকযোগে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে উত্তরদাতার নিকট প্রেরণ করা হয় বিধায় এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হলে গবেষক বা গবেষক কর্তৃক মনোনীত কোনো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সাথে উত্তরদাতার সরাসরি কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। অপরদিকে অনুসূচির মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও সাক্ষাৎকার দানকারী একই স্থানে সামনাসামনি বসে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে পারস্পরিক আলাপে লিপ্ত হন।

প্রশ্নমালার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Questionnaire)

প্রশ্নমালার শ্রেণীবিভাগ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। যথা :

* উত্তরের ধরন
* উত্তরদাতার নিকট প্রশ্নমালা কিভাবে দেওয়া হয় (প্রশ্নমালা বিতরণ পদ্ধতি)

উত্তরের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালাকে দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা :

১. নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা, এবং ২. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা।

নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা (Fixed-response questionnaire)

নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালাতে প্রত্যেক প্রশ্নের সাথে সম্ভাব্য কিছুসংখ্যক উত্তর লিপিবদ্ধ থাকে। উত্তরগুলোর মধ্য থেকে উত্তরদাতার বিবেচনায় প্রশ্নানুযায়ী যে উত্তরটি সব থেকে বেশি প্রযোজ্য সেটিতে টিক (√) দেওয়ার কথা থাকে। এ ধরনের প্রশ্নমালা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা গবেষক ব্যবহার করেন কেবলমাত্র তখনই যখন তিনি প্রশ্নের উত্তরের ধরন সম্পর্কে যথাযথ পূর্বানুমানে পৌছাতে পারেন এবং নিশ্চিত থাকেন যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে উত্তরদাতারও যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে।

নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১. নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উত্তরসমূহ বিশ্লেষণের সুবিধার্থে অতি সহজে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা সম্ভব। উত্তরসমূহ নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বিধায় উত্তরগুলোকে অতি সহজেই সংকেত দ্বারা চিহ্নিতকরণ (Coding) সম্ভব হয়। সংকেতায়নের সময় গবেষক প্রত্যেক উত্তরের বিপরীতে সুবিধামতো একটি সংখ্যা ব্যবহার করেন। যেমন :

বর্ণনাতীত সুখী	= ৭
খুব বেশি সুখী	= ৬
খুব সুখী	= ৫

সুখী = ৪
খুব অসুখী = ৩
খুব বেশি অসুখী = ২
বর্ণনাতীত অসুখী = ১

২. এই ধরনের প্রশ্নমালা থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সাহায্যে অতি সহজেই সারণি (Table) প্রস্তুত করা সম্ভব যার মাধ্যমে তথ্যসমূহের পারস্পরিক তুলনা ও বিশ্লেষণ সহজতর হয়।

৩. এ ক্ষেত্রে উত্তরদানের জন্য উত্তরদাতাকে বেশি কিছু লিখতে হয় না—শুধু স্বীয় পছন্দের উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন দিলেই চলে। এ কারণেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকেরাও এ পদ্ধতিতে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করতে পারে।

৪. উত্তর প্রদানের জন্য যেহেতু উত্তরদাতাকে তেমন বেশি কিছু লিখতে হয় না, সেহেতু অতি স্বল্প সময়েই উত্তরদাতার পক্ষে সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান সম্ভব হয়। ফলে উত্তরদাতাগণ এহেন প্রশ্নমালাতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন।

৫. ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালা যদি নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা হয়, তবে উত্তরদানকারীর পক্ষ থেকে পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে।

অসুবিধা

১. নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালার প্রশ্নসমূহের সম্ভাব্য উত্তর সব সময় খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য উত্তর প্রশ্নমালা থেকে বাদ পড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে উত্তরদাতা তাঁর জন্য যে উত্তরটি প্রযোজ্য সেটির অভাবে এমন উত্তর বেছে নেন যা আদৌ প্রযোজ্য নয়। এমতাবস্থায় সংগৃহীত তথ্য গবেষণার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. এ প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতার মধ্যে একই ধরনের উত্তরদান প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না' যোগে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নের দিকে ঠিকমতো না তাকিয়েই তিনি তাঁর উত্তর 'হাঁ' বা 'না' যোগে দিয়ে ফেলতে পারেন।

উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (Open-end Questionnaire)

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার প্রশ্নের শেষে কোনো প্রকার উত্তর দেওয়া থাকে না। তাই উত্তরদাতাকে প্রশ্নের শেষে ছোট বা বড় আকারে লিখে দিতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের শেষে উত্তরদানের জন্য কিছু জায়গা নির্ধারিত থাকে যা উত্তরদাতা কর্তৃক পূরণীয়। যেমন : আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো/খারাপ হওয়ার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই লিখতে পারেন।

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১. নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা যেখানে তথ্য সংগ্রহ অক্ষম, সেখানেও উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। গবেষক যেখানে উত্তরদাতা বা নমুনা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না এবং প্রশ্নসমূহের সম্ভাব্য উত্তরগুলো নির্ধারণে অক্ষম হন, তখন তিনি শেষ অস্ত্র হিসেবে এই প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। উক্ত ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত উত্তরমূলক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয় তাহলে ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বৃদ্ধি পায়।

২. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাগণ উত্তরদানের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাই তিনি অত্যন্ত খোলামেলাভাবে বিষয়ের উপরে আলোকপাত করার সুযোগ পান। এর ফলে গবেষক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন জ্ঞান ও তথ্য উত্তরদাতাগণের কাছ থেকে লাভ করেন যা সমস্যা সম্পর্কে গবেষককে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অনুপ্রেরণা যোগায়।

অসুবিধা

১. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতির সব থেকে বড় ধরনের অসুবিধা হলো এই যে, এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সংকেতায়ন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা খুবই কঠিন।

২. গবেষণার এলাকাভুক্ত প্রতিজন উত্তরদাতাই যদি শিক্ষিত হন, কেবল সে ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ অশিক্ষিত উত্তরদাতার পক্ষে লিখিতভাবে উত্তর প্রদান করা সম্ভব নয়।

৩. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা পূরণ করতে অনেক সময়ের দরকার হয়। তাই এই প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদানে অনেকেই অসম্মতি জানান।

৪. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ডাকযোগে উত্তরদাতার বরাবর পাঠালে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম।

বিতরণ পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্নমালার শ্রেণীবিভাগ

উত্তরদাতাকে প্রশ্নমালা বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা : (১) ডাকযোগে পাঠানো এবং (২) সামনাসামনি বিতরণ।

ডাকযোগে পাঠানো প্রশ্নমালা (Mailed Questionnaire)

এ পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্নমালা প্রত্যক্ষভাবে বিতরণ না করে ডাক বিভাগের মাধ্যমে উত্তরদাতার নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গবেষক ও উত্তরদাতার মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। যে কোনো সূত্র থেকে গবেষক উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেন এবং উত্তরদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলিসহ প্রশ্নমালা ডাকযোগে তাঁর বরাবর পাঠিয়ে দেন। প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠানোর জন্য ফেরতযোগ্য খামও প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করার পরও উত্তর না পাওয়া গেলে গবেষক উক্ত ঠিকানায় আবার যোগাযোগ করেন। সাধারণত শতকরা ৭০-৮০ ভাগ প্রশ্নমালা ফেরত পাওয়া যায়।

সামনাসামনি বিতরিত প্রশ্নমালা (Questionnaire Distributed Face to Face)

অনেক ক্ষেত্রে পূর্বনির্বাচিত উত্তরদাতার উপস্থিতিতে পূর্বনির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর গবেষক বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উত্তরদাতাগণ তা পূরণ করে ফেরত দেন। অনেক সময় প্রশ্নমালা উত্তরদাতাকে দলগতভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। সামনাসামনি বিতরিত প্রশ্নমালায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে :

* সাক্ষাৎকারের জন্য তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারিত হওয়ার দরকার হয়। তারিখ, সময় ও স্থান উত্তরদাতার সুবিধামতো হলে উপস্থিতির পরিমাণ বেশি হয়।
* প্রশ্নমালার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বধারণা থাকলে উত্তরদাতার উপস্থিতি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
* প্রশ্নমালা বিতরণকারীর জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি উত্তরদাতার উপস্থিতির উপর প্রভাব ফেলে।

প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার অনুসূচি তৈরির প্রক্রিয়া ও পর্যায়সমূহ

সামাজিক গবেষণা বা সামাজিক জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরিকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে শেষ অবস্থায় আনতে অনেকগুলো পর্যায় অনুসরণ করতে হয় এবং প্রতিটি পর্যায়েই অনেক কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন। প্রশ্নমালার কাঠামো তৈরি করা একটি কৌশল বা বিশেষ শিল্প হিসেবে বিবেচিত। নিপুণ, নিখুঁত ও চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নমালা তৈরির উপর সামাজিক গবেষণার ফলাফল দারুণভাবে নির্ভরশীল। একটি ভালো প্রশ্নমালা তৈরির জন্য গবেষণার ক্ষেত্র ও গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কেবল একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উত্তরদাতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের কথা বিবেচনায় রেখে একটি সার্থক প্রশ্নমালা দাঁড় করাতে পারেন। একটি সার্থক প্রশ্নমালা বা অনুসূচি প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধানত নিচের ছয়টি পর্যায় অনুসরণ করতে হয় :

১. প্রশ্নপত্র তৈরির প্রথম পর্যায়ে গবেষক তথ্যের উৎস বা সমগ্রক নির্ধারণ করবেন। গবেষক যদি সমগ্রকের সাথে ভালোভাবে পরিচিত না হন তাহলে প্রশ্নমালার পদ (Item) নির্বাচন তাঁর জন্য অত্যন্ত জটিল হবে। কোন কোন উৎস থেকে অর্থাৎ কাদের থেকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তা নির্ধারণ করা উচিত। তাই প্রথমেই গবেষকের উচিত হবে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত কী কী বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

২. তথ্যের উৎস ও সমগ্রক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর প্রশ্নের বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে (Sequence) সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে সুসজ্জিতকরণের দুটি দিক রয়েছে। যেমন : (ক) কোন প্রশ্ন আগে ও কোন প্রশ্ন পরে করতে হবে তা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ঠিক করা এবং (খ) একটি প্রশ্নমালার একই প্রশ্ন একের অধিক উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে তা আলাদাভাবে সজ্জিত করা। একটি প্রশ্নমালাভুক্ত একই প্রশ্নের উত্তর একের

অধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগৃহীত হলে এবং তা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা না থাকলে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। যদি এমন হয় যে, একটি প্রশ্নমালার অধিকাংশ প্রশ্নই স্বামীকে এবং অল্পসংখ্যক প্রশ্ন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, তবে সে ক্ষেত্রে একই প্রশ্নমালায় স্বামীকে জিজ্ঞাস্য ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহ আলাদাভাবে নির্দিষ্ট স্থানে সজ্জিত করতে হবে। একই প্রশ্নমালায় একটি স্বামীকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন অপরটি স্ত্রীকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এভাবে সজ্জিত করলে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চরম জটিলতা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্নের ক্রমপর্যায়করণের (Sequence of the questions) ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য :

* ক্রমপর্যায় এমন হওয়া উচিত যা উত্তরদাতার কাছে সহজবোধ্য বলে মনে হবে এবং তা উত্তরদানের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে অনুপ্রাণিত করবে।
* প্রশ্নগুলো সজ্জিতকরণের সময় লক্ষ্য করতে হবে যেন একটি প্রশ্ন উত্তরদাতাকে আর একটি প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়। তাহলে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
* যে-সব প্রশ্নের উত্তরদান সহজ তা প্রথম দিকে রাখতে হবে। নাম, সম্পর্ক, বয়স প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে প্রথম দিকে সাজানো ভালো।
* অসংবেদনশীল প্রশ্নগুলো প্রথম দিকে এবং সংবেদনশীল প্রশ্নগুলো শেষের দিকে রাখা দরকার।
* একই বিষয় সম্বলিত সব ক'টি প্রশ্ন একই সাথে পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে।
* প্রশ্নের সন্নিবেশ ধারা যেন উত্তরদাতার মনের চিন্তার প্রবাহকে সামান্যতমও ব্যাহত না করে সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে।
* অন্য প্রশ্নের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন প্রশ্ন প্রথম দিকে প্রদান করা ঠিক নয়।

৩. প্রশ্নমালা তৈরির তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হলো প্রশ্নের ধরন নির্ধারণ এবং ভাষা ও শব্দ চয়ন। প্রশ্নের ধরন ও প্রশ্নে শব্দের ব্যবহার উত্তরদাতার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাই এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে প্রণীত প্রশ্নমালা হতে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা যায় না। প্রশ্নের ধরন বলতে গবেষক যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক কেবল সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন প্রণয়নকে বুঝায়। অনেক সময় গবেষক কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি প্রশ্ন করেন, আবার কোনো কোনো সময় পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উত্তর সংগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রশ্ন বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়বস্তুর উপর। সরাসরিভাবে প্রশ্ন করা অতি সহজ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এহেন প্রশ্নের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে সামাজিক গবেষণায় এমন অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে মানুষ সাধারণভাবে

আলোচনায় লিপ্ত হতে চায় না বা সে বিষয়ে সরাসরি তথ্য সরবরাহ করতে ইতস্তত বোধ করে। যেমন, পরিবারের আয়-ব্যয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রাপ্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুতরাং গবেষককে প্রশ্নমালা প্রণয়নকালে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। প্রশ্নের ধরনসংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর তা যথার্থরূপে লিপিবদ্ধকরণের ধরন সম্পর্কে আবার চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হয়। যথার্থ শব্দ চয়ন সঠিকভাবে প্রশ্ন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। আবার এ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার হয় যে, উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর যেভাবে প্রদান করবেন হুবহু সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হবে না কি পূর্বনির্ধারিত কিছু সংখ্যক উত্তরের মধ্য থেকে তা চয়ন করে নিতে হবে। যেমন :

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

এ প্রশ্নের নিচে অল্পকিছু খালি স্থান রাখা যায় যেখানে উত্তর লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয়। আবার অপর পৃষ্ঠার উদাহরণ অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়ন করে উত্তর লেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন : আপনার পেশা কি?

- ☐ কৃষিকাজ
- ☐ চাকুরি
- ☐ ব্যবসা
- ☐ গৃহিণী
- ☐ ছাত্র
- ☐ বেকার
- ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

এখান থেকে যে কোনো উত্তর পছন্দ করে অতি সহজেই টিক চিহ্ন (√) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পূরণ করা সম্ভব।

প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রশ্নের শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে উত্তরদাতার জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। প্রশ্নে সহজ-সরল শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। উত্তরদাতার বোধগম্য নয় এমন শব্দ ব্যবহার করা আদৌ সমীচীন নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো শব্দ দ্বারা প্রশ্নমালা প্রণয়নকারী যা বুঝাতে চান উত্তরদাতাও তা বুঝবেন কিনা। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট শব্দ যাতে ব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উত্তরদাতাকে বিব্রত করে কিংবা লজ্জাকর অবস্থায় ফেলে এমন শব্দ পরিহার করতে হবে। প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে :

* প্রশ্ন কি কোনো খারাপ শব্দ ব্যক্ত করে?
* প্রশ্নটি কি কোনো কষ্টকর বা অস্পষ্ট শব্দ ধারণ করে?
* প্রশ্নের কোনো শব্দের বা বাক্যাংশের উপর জোর দেওয়া হলে প্রশ্নের অর্থ কি বদলে যাবে?
* প্রশ্নটি কি বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিকল্প কোনো অর্থ প্রকাশ করে?
* প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দগুলো কি পক্ষপাতদুষ্ট? এটা কি বিশেষ আবেগ দ্বারা ভারাক্রান্ত?
* বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী ব্যক্তিবর্গ প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে গ্রহণ করবেন কি?
* প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দগুলো কি কোনোভাবে উত্তরদাতার নিকট আপত্তিকর বলে মনে হবে?
* প্রশ্নে কোনো টেক্‌নিক্যাল শব্দ (Technical word) ব্যবহৃত হয়েছে কি?
* অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রশ্নের দ্বারা কি অধিকতর উত্তর ফলাফল লাভের সম্ভাবনা আছে?
* অধিকতর প্রত্যক্ষ বা অধিকতর পরোক্ষভাবে প্রশ্নটি কি আরো উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে?

৪. খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করার পর উক্ত প্রশ্নমালার যথার্থতা (Validity) নির্ণয় করা অপরিহার্য। প্রশ্নমালার যথার্থতা নির্ণয় বলতে বুঝায় যে-বিষয় পরিমাপ করার জন্য প্রশ্ন গঠন করা হয়েছে প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষেই সে-বিষয় পরিমাপ করে কিনা। যথার্থতা নিরূপণের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই বা তিন জন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ। যদি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রশ্নমালার প্রশ্নসমূহ যে-বিষয় পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে সেটা পরিমাপ করে, তবে প্রশ্নমালাটি যথার্থ বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রশ্নমালার এরূপ যথার্থতাকে বস্তুগত যথার্থতা (Content validity) নামে অভিহিত করা হয়।

৫. প্রশ্নমালা প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায়ের পদক্ষেপ হলো খসড়া প্রশ্নমালাটিকে কোনো প্রতিনিধিত্বকারী নমুনার (Representative sample) উপর প্রয়োগ করে তার ফলাফল পরীক্ষাকরণ। এ ধরনের পরীক্ষাকে অগ্রবর্তী জরিপ (Pilot survey) বলা হয়ে থাকে। অগ্রবর্তী জরিপে লক্ষ্য করতে হবে যে, উত্তরদাতাগণ প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা এবং কি ধরনের উত্তর তাঁরা সরবরাহ করেছেন। অগ্রবর্তী জরিপের ফলাফল বিচার করে অনেক প্রশ্নের ভাষা ও শব্দ পরিবর্তন করা দরকার। আবার এমনও হয় যে, অনেক প্রশ্নের পৃথকীকরণ ক্ষমতা (Discriminative power) বিচার করে অযোগ্য প্রমাণিত হলে তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা হয়। উত্তরদানের ক্ষেত্রে যদি এমন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে,

কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরদানের ব্যাপারে উত্তরদাতাগণ শুধু 'হাঁ' বা 'না' যোগে উত্তর প্রদান করেছেন, তবে ধরে নেওয়া হয় যে, এসব প্রশ্নের পৃথকীকরণ ক্ষমতা নেই। সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে অন্যভাবে প্রশ্ন গঠন করা হয়।

অগ্রবর্তী জরিপের সাহায্যে সংশোধনের পর যে প্রশ্নমালা গঠিত হয় তাকে একটি যথার্থ প্রশ্নমালা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে জানা থাকা দরকার যে, নবগঠিত প্রশ্নমালার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আরো কতকগুলো পদক্ষেপ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে প্রধান পদক্ষেপটি হলো নবগঠিত প্রশ্নমালাটিকে অন্য একটি যথার্থ প্রশ্নমালার সাথে তুলনা করে দেখা। যদি দুটি প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একই দাঁড়ায় তবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নতুন প্রশ্নমালাটিও যথার্থ। যথার্থতা যাচাই করার অপর একটি পদক্ষেপ হলো প্রশ্নমালার পূর্বাভাসমূলক যথার্থতা (Predicitive validity) নিরূপণ করা। অবশ্য এ পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশ্নমালাকে কোনো একটি সমগ্রকের উপর প্রয়োগ করে তার থেকে প্রাপ্ত সাফল্যাংক (Score) বের করা হয়। পরে বাস্তব ক্ষেত্রে এদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখতে হয়। যদি লক্ষ্য করা যায় যে, বাস্তব ক্ষেত্রের কার্যকলাপের সাথে প্রশ্নমালার ফলাফলের মিল রয়েছে তবে প্রশ্নমালাটি প্রকৃতপক্ষেই যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে।

৬. বিভিন্নভাবে প্রশ্নমালার যথার্থতা পরীক্ষণের পর যখন প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে, তখন গবেষককে প্রশ্নমালা ছাপানোর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পূর্বে সাইক্লোস্টাইল করা হতো বা প্রেস থেকে প্রশ্নমালা ছাপানো হতো। বর্তমানে কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রশ্নমালা ছাপানো হচ্ছে। এতে প্রশ্নমালা ছাপার মান অনেক উন্নত হয়। প্রশ্নমালা ছাপানোর আগে প্রুফ দেখে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া গবেষকের অপরিহার্য দায়িত্ব।

প্রশ্নমালা পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Questionnaire Method)

তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নমালার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এর সুবিধাসমূহ এর জনপ্রিয়তার কারণ। নিচে প্রশ্নমালা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো :

* প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে গবেষক বা প্রশ্নমালা প্রণয়নকারী প্রশ্নগুলোর শব্দ এমনভাবে চয়ন করেন যাতে উত্তরদাতার মনে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।
* একই প্রশ্নের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশের সুযোগ রাখা হয় না।
* সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতাকে উত্তরদানের ব্যাপারে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো উত্তরদাতার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত উত্তর লাভ করা যায়। কিন্তু প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় এবং উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তা বা তাঁর অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির সাহায্য ছাড়াই তা পূরণ করে ডাকযোগেই

ফেরত পাঠান। তাই এ পদ্ধতিতে পক্ষপাতদুষ্টতার অনুপ্রবেশের কোনো প্রকার সুযোগ সৃষ্টি হয় না।

* এই পদ্ধতি গবেষকের সময়, পরিশ্রম ও অর্থ বাঁচায়। উত্তরদাতা যখন ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে থাকেন বা এমন এলাকায় বা স্থানে অবস্থান করে যেখানে গবেষকের সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব হয় না, তখন তিনি অতি সহজে ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করে উত্তর সংগ্রহ করতে পারেন।
* প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে প্রত্যেক উত্তরদাতাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, সরবরাহকৃত তথ্যের গোপনীয়তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে উত্তরদাতা সঠিক উত্তর প্রদানে সাহস করেন।
* এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতাকে প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয় সময় প্রদান করা হয়। এজন্য তিনি নিজস্ব বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের উপযুক্ত সময় পান।
* একই ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে একাধিক বার প্রশ্নমালা পাঠিয়ে পুনঃপুন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সময়ের পরিবর্তনজনিত কারণে একই প্রশ্নের ব্যাপারে উত্তরদাতার মনোভাব জানা সম্ভব হয়।
* এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতার সাথে প্রশ্নকর্তার পূর্বপরিচয়ের বা সাক্ষাৎকারের দরকার হয় না।
* এমন অনেক বিষয় আছে যা সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সামনাসামনিভাবে উত্তর প্রদান করতে রাজি হন না। যেমন : পারিবারিক আয়-ব্যয়, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তরদানের ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি থাকে না।
* এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর নথিপত্র না দেখে চট করে দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রশ্নমালা পদ্ধতির মাধ্যমে এহেন প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে প্রদান করা সম্ভব।
* অনেক ক্ষেত্রে ঠিকানা অনুযায়ী উত্তরদাতার বাসা খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয় না বা খুঁজে পেতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সে ক্ষেত্রে ডাকযোগে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করে অতি সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

প্রশ্নমালা পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantage of Questionnaire Method)

বহুবিধ সুবিধার পাশাপাশি প্রশ্নমালা পদ্ধতির কিছু কিছু অসুবিধাও রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

* এ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। প্রশ্নমালা পড়ে বুঝে উত্তরদাতাকে নিজে নিজেই উত্তর লিখিতভাবে প্রদান করতে হয় বিধায় অশিক্ষিত উত্তরদাতার পক্ষে এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।

* এই পদ্ধতির আর একটি বড় ধরনের অসুবিধা এই যে, উত্তর প্রাপ্তির হার কেমন হবে তা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দলগতভাবে বন্দোবস্তকৃত প্রশ্নগুলো সাধারণত উচ্চ প্রতিযোগিতা হার সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার যে সব প্রশ্ন আয়-ব্যয় কিংবা পরিকল্পনা সংক্রান্ত তার উত্তর প্রাপ্তির হার অত্যন্ত কম হয়। গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার উত্তর প্রাপ্তির হার ২০% থেকে ৩০% উঠানামা করে।

* অনুন্নত দেশের ডাক ব্যবস্থাও অনুন্নত হওয়ার কারণে প্রশ্নমালা পদ্ধতির উপর উক্ত ডাক ব্যবস্থা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় প্রশ্নপত্র যথাস্থানে যথাসময়ে পৌছে না বা উত্তরদাতা কর্তৃক ফেরত পাঠানো প্রশ্নমালা গবেষকের নিকট যথারীতি আসে না। ফলে গবেষণা প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

* সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তরদানের প্রাক্কালে উত্তরদাতা যা বলছেন তা কতখানি সত্য তা তাঁর বাচনভঙ্গি, আচার-আচরণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে অনুমান করা যায়। অথচ ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার উত্তরকেই চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নিতে গবেষক বাধ্য হন। কারণ উত্তরের যথার্থতা যাচাই করা বা কোথাও কোনো দুর্বোধ্যতা থাকলে তা উত্তরদাতার কাছ থেকে পরিষ্কার করে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

* প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাগণ প্রশ্নমালার বক্তব্য ও বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই অনেক সময় উত্তরদাতাকে অনেক প্রশ্ন ভালোভাবে না বুঝেই তার উত্তর প্রদান করতে হয়। এতে যথার্থ তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত তা গবেষণার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

* অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিও উত্তরদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশ্ন তাঁদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে বলে অনুভব করেন। ফলে তাঁরা এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরদানে বিরত থাকেন। অথবা উত্তর দিলেও তা গবেষণার জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

* এই পদ্ধতিতে জটিল সমস্যাগুলোর উপর বিস্তারিতভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ এই পদ্ধতিতে ডাকযোগে যাদের বরাবর প্রশ্নমালা পাঠানো হয় তাঁরা বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। অধিকাংশ সময়ই তাঁরা ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। তাই তাঁদেরকে জটিল প্রশ্নসমূহের উত্তরদানের বিষয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে নিজেদেরকে উক্ত কাজে নিয়োজিত করতে খুব কমই দেখা যায়।

* প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে কোনো উত্তরদাতা উত্তরদানের পূর্বেই সব প্রশ্ন এক বা একাধিকবার পড়তে পারেন। ফলে উত্তরদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নের প্রতি আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্ব প্রদান করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কোনো প্রশ্ন তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ও কোনো প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতেই

পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের উত্তর গুরুত্বসহকারে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর তাচ্ছিল্যসহকারে প্রদান করে থাকেন।

অপরপক্ষে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি প্রশ্নের পর অন্য কী প্রশ্ন করবেন তা উত্তরদাতা জানেন না। ফলে প্রতিটি প্রশ্নই তাঁর নিকট নতুন ও সমান গুরুত্ব বহন করে। তাই তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই গুরুত্বসহকারে প্রদানে সচেষ্ট থাকেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা পদ্ধতি অপেক্ষা সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হতে ভালো ফলাফল লাভ করা যায়।

* খারাপ হাতের লেখা বিশিষ্ট উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করলে তা থেকে সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনেক সময় উত্তরদাতা উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেন যা গবেষক সঠিকভাবে সব সময় বুঝে উঠতে পারেন না।

* যে সমাজ বা জনগোষ্ঠী থেকে উত্তর সংগৃহীত হয় গবেষক সেই সমাজের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান না। অথচ গবেষণার স্বার্থে অনেক সময় এসব বিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

দশম অধ্যায়

তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ
DATA COLLECTION AND OBSERVATION

সাধারণত ধারাবাহিকভাবে অবলোকন করাকে 'পর্যবেক্ষণ' বলা হয়। সমাজ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ বলতে উপাত্ত সংগ্রহের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বুঝায়। এটি তথ্য সংগ্রহের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে গবেষক গবেষণার পরিবেশকে কখনো কোনোভাবে প্রভাবিত করেন না। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, পর্যবেক্ষণ এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যাতে গবেষক গবেষণা পরিবেশের উপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে বা কোনো চলকের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল আচরণ বা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ গবেষক সামাজিক অবস্থাকে কোনো প্রকার বাধাগ্রস্ত না করেই তথ্য সংগ্রহ করেন। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল যেভাবে আচরণ করে তা হুবহু অবলোকন করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই সমাজ থেকে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়।

বিচিত্র এই পৃথিবীর দিকে তাকালে পর্যবেক্ষণ করার মতো অনেক কিছুই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণভাবে চোখে দেখা এবং বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষকও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ঘটনাবলির মধ্য থেকে তাঁর গবেষণার জন্য প্রযোজ্য এমন কোন বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন তা নির্দিষ্টরূপে ঠিক করে উঠতে পারেন না। অথচ প্রকৃতির বা সমাজের বিভিন্ন বস্তু বা মানুষের মধ্য থেকে সঠিক বিষয়টি খুঁজে বের করা এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করাই পর্যবেক্ষকের আসল কাজ। পর্যবেক্ষণের কাজটি সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্য গবেষকের পর্যাপ্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দরকার হয়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরাসরিভাবে সংগৃহীত হয়। যেমন, যদি কোনো গবেষক গ্রামবাংলায় কিভাবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চান বা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ সম্পর্কে সরাসরিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাহলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট সমাজে অবস্থান করে বিষয়সমূহের প্রতি পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। জনগোষ্ঠীর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সার্থকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে গবেষককে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে :

* গবেষককে প্রথমেই সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে যে, তিনি কোন বিষয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবেন।
* এরপর তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কীভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।
* অতঃপর যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে।
* গবেষক ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হতে হবে এবং তা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে সে বিষয়েও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Observation)

গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতি থেকে পৃথক করে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

* এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশের কোনোরূপ রদবদল করা হয় না।
* পরিবেশকে অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী, শ্রেণী বা দলের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় বিধায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণসংক্রান্ত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা যায়।
* পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর আচরণসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয় না, যে পটভূমিতে আচরণ সংঘটিত হয় সেই পটভূমি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়।
* এই পদ্ধতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণকৃত জনগোষ্ঠীর আচরণকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে এমন বিষয়াদি সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়।
* এই পদ্ধতির মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তা পর্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট পটভূমি থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে :

১. **নোট করা :** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে সব তথ্য যখনই পাওয়া যাবে তখনই সে সব তথ্য নোট করে ফেলতে হবে। কারণ যে কোনো মুহূর্তে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য পর্যবেক্ষণকারীর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে। তাই যখন যেখানে যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে তখনই তা লিখে রাখা সব থেকে উত্তম।

২. **চিত্রগ্রহণ :** গবেষণা কর্মে গবেষককে বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা বা অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হয়। লিখিত বর্ণনার পাশাপাশি যদি ঘটনা যেখানে যে পরিবেশে বা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে তার চিত্র দেওয়া হয় তাহলে বর্ণনা আরো সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। চিত্রের মাধ্যমে মূল ঘটনা ছাড়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় তুলে ধরা সম্ভব যা পাঠকের জন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভে বিশেষ সহায়ক হয়।

৩. **মানচিত্রের ব্যবহার :** গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যে এলাকায় বসবাস করে সে এলাকার একটি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুত করে গবেষণা কর্মের সাথে সংযোজন করলে বিষয়বস্তু আরো পরিস্ফুটিত হয়। আজকাল অনেক গবেষণা কর্মেই পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার মানচিত্র তৈরি করে সংযোজন করা হয় যা গবেষণার মানকে আরো উন্নত করে।

৪. **অনুসূচি প্রস্তুত :** যে কোনো গবেষণা পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা হোক না কেন তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক অনুসূচি সেই প্রক্রিয়াকে সহজ ও উন্নততর করে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোন কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, সংগৃহীত তথ্য কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পর্যবেক্ষণ অনুসূচি প্রণয়ন করলে অতি সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এহেন অনুসূচি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে পৃথক করে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে পর্যবেক্ষককে পথ নির্দেশ করে।

পর্যবেক্ষণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Observation)

পর্যবেক্ষণকে দু'ধরনের ভিত্তিতে বিভক্ত করা যায়। এর একটি হলো নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত এবং অপরটি পর্যবেক্ষকের ভূমিকাসংক্রান্ত।

অনুসন্ধানের পটভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণকে আবার নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা হয় :

১. প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ (Naturalistic observation) ;
২. নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Controlled observation)।

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণকারী প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে আচরণ যেভাবে সংঘটিত হয় ঠিক সেভাবেই পর্যবেক্ষণ করেন। পরিবেশ–পরিস্থিতির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গবেষক এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন না। যেমন : কোনো গবেষক যদি হেলিকপ্টার থেকে বা অন্য কোনো উপায়ে দূর থেকে জঙ্গলের প্রাণীদের আচরণ প্রত্যক্ষ করেন তবে তাকে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ বলা হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে তিনি জঙ্গলের পরিবেশ–পরিস্থিতির স্বাভাবিক গতির উপর কোনোই হস্তক্ষেপ করেন নি। অনুরূপভাবে যদি কোনো গবেষক কোনো শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকে সমুদ্রের মাছ বা জলজ প্রাণীদের পারস্পরিক আচার–আচরণের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেন তবে সেটিও প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে পড়বে।

নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে পরীক্ষণ প্রক্রিয়া (Experimental procedure) অনুযায়ী পর্যবেক্ষণের কাজ সংঘটিত হলে তাকে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ বলে। অনেক সময় পর্যবেক্ষণকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক চলকের প্রভাব থেকে পর্যবেক্ষণীয় আচরণকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এহেন ব্যবস্থা

BANSDOC Library
Accession No. 18398

গ্রহণের ফলে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রয়োজনীয় ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। বর্তমানে সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপযোগ্য তথ্য (Mesurable data) সংগ্রহ সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কথা চিন্তা-ভাবনায় আনা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণের কাজে শব্দধারক যন্ত্র, গতিবিধি লিপিবদ্ধকরণ যন্ত্র, ক্যামেরা, পর্যবেক্ষণ অনুসূচি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জীব-জন্তুর পারস্পরিক আচরণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছুসংখ্যক জীব-জন্তুকে চিড়িয়াখানার নিয়ন্ত্রিত পরিসরে আনা হলো এবং একমুখী আয়না ব্যবহার করে তাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করা হলো যাতে গবেষকের উপস্থিতি তাদের আচরণের উপর কোনো প্রকার প্রভাব ফেলতে না পারে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণকে আবার নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা হয় :

১. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant observation)
২. অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ (Non-participant observation)

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

গবেষক যখন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত হন তখন তাকে অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ বলে। এ ক্ষেত্রে গবেষক সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। উক্ত জনগোষ্ঠীর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে গবেষক প্রতিদিন কি ঘটছে, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ কেমন, আচার-আচরণের পরিবর্তন প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কড়া নজর রাখেন। অনেক সময় গবেষক তাদের সাথে ভালোভাবে মিশে যাবার জন্য তাদের ভাষা ও কথোপকথনের রীতি আয়ত্ত করেন। পর্যবেক্ষকের কাজ হলো সংশ্লিষ্ট লোকের সাথে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে নেওয়া যাতে তিনি তাদের জীবন প্রণালি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ও পক্ষপাতহীন চিত্র তুলে ধরতে পারেন। তাই তাঁকে আয়ত্ত করতে হয় সেই সব গুণ যা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে সহায়তা করে। এসব গুণ অবশ্য জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও আকার, পর্যবেক্ষক জনগোষ্ঠীর কী দেখতে চান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। জনগোষ্ঠী যদি তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট হয় (একটি পরিবার) তবে তার মধ্যে বসবাস করা গেলেও পূর্ণ সদস্য হওয়া সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে গবেষকের স্বাতন্ত্র্য ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হয় এবং তিনি অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হতে পারেন। আর যদি জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকারের হয় তবে গবেষকের পক্ষে তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা অধিকতর সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি অতি সহজেই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন এবং নিজেকে উক্ত সমাজের একজন সদস্য হিসেবে ভাববার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা অনুভব করেন না। সমাজের অন্যান্য সদস্যও গবেষকের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। ফলে গবেষক স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ দু'ভাবে সংঘটিত হতে পারে : ১. গবেষক নিজেই কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন, অথবা ২. উক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য না হয়েও তিনি ঐ

জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা না হওয়া নয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গবেষক সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য হউন বা না হউন, তাঁকে উক্ত জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে হবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রক্রিয়ায় কোনো পূর্ব অনুমান প্রণয়ন করা হয় না। পর্যবেক্ষণকারীর কাজ হলো যা ঘটে তা প্রত্যক্ষ করা এবং সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করা।

অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ

অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ হলো সেই পর্যবেক্ষণ যেখানে গবেষক জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না বরং জনগোষ্ঠীর সচরাচর কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে চলতে দিয়ে তা পর্যবেক্ষণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি গোষ্ঠীর কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং ধারাবাহিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করেন, অথচ কখনও তাদের সদস্যদের ন্যায় গোষ্ঠীকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না। এই পদ্ধতিতে সদস্যদের স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে গবেষককে কিছু দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করা প্রয়োজন যাতে তাঁর উপস্থিতিকে সব সদস্যই স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে গবেষককে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় যাতে তাঁর তথ্য সংগ্রহকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের বিষয়সমূহকে কেউ সন্দেহের চোখে না দেখে।

কোনো গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল লাভ করা যায়। গবেষণার বিষয় নির্বাচন ছাড়াও কোনো জনগোষ্ঠীর বাস্তব কর্মতৎপরতার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানার জন্য প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অতি উত্তম। কিন্তু এই পদ্ধতির একটা বড় রকমের অসুবিধা হলো এই যে, অনেক সময় এটা আচরণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। গোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন একজন লোকের পক্ষে আচরণের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে গোষ্ঠীর সদস্যদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা সত্যিই কঠিন কাজ।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Observation Method)

* পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ-সরল একটি পদ্ধতি। গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতির মতো জটিল প্রক্রিয়া এখানে অনুসরণ করা হয় না। গবেষক শুধু তাঁর চোখ দু'টোকে সম্বল করেই এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
* এই পদ্ধতিতে মানুষের আচার-আচরণ যেখানে যেভাবে প্রকাশ পায় ঠিক সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘটনা সংঘটনের পরিবেশের উপর সব ধরনের প্রভাব ব্যতিরেকে ঘটনার স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় বিধায় এই পদ্ধতিতে অবিকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়।
* শিশু বা মানসিক প্রতিবন্ধী যারা নিজের বা সমাজ সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য প্রদান করতে পারে না, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায়।

* পৃথিবীতে এমন অনেক দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠী রয়েছে যারা নিজেদের সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। তারা কোনো গবেষককে তাদের সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করার অনুমতিও দেয় না। এমতাবস্থায় উক্ত সমাজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ একমাত্র পদ্ধতি।
* সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা সাক্ষাৎকার দানে রাজি হয় না বা সময়ের অভাবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে না, সে ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে উক্ত লোকদের কাছ থেকে অনায়াসেই তথ্য সংগৃহীত হয়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantage of Observation Method)

* এই পদ্ধতিতে গবেষককে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু দিন অবস্থান করতে হয় যা সব সময় গবেষকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।
* এই পদ্ধতির আর একটি বড় অসুবিধা হলো এই যে, কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষককে ঐ ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় থাকতে হয়। যেমন কোনো গবেষক যদি এই পদ্ধতিতে কোনো উপজাতির বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাহলে তাঁকে ঐ উপজাতির একটি বিবাহ অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
* এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেক গবেষকেরও স্বীয় দর্শন, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদি থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে পর্যবেক্ষণের সময় সংগৃহীত তথ্যের উপর গবেষকের উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তথ্যকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট করে।
* গবেষক কোনো ঘটনা ততক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন যতক্ষণ ধরে উক্ত ঘটনাটি ঘটে। অর্থাৎ ঘটনার স্থায়িত্বের উপর পর্যবেক্ষণ নির্ভরশীল। একদিকে যেমন অতি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা দুরূহ, তেমন দীর্ঘদিন ধরে সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করাও বিরক্তিকর।
* একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক।
* এই পদ্ধতির মাধ্যমে মতামত জরিপ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি কাজ সম্ভবপর হয় না।

একাদশ অধ্যায়

তথ্য সংগ্রহ ও নমুনায়ন
DATA COLLECTION AND SAMPLING

কোনো সমস্যা বিশেষ করে সামাজিক সমস্যা দু'ভাবে পরিচালিত হতে পারে :

১. গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্র জনগোষ্ঠীর উপর অনুসন্ধান বা জরিপ চালানো।

২. সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশের উপর জরিপ চালানো।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্র জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ চালানোকে সমগ্রক জরিপ (Population survey) এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশের উপর জরিপ চালানোকে নমুনা জরিপ (Sample survey) বলা হয়।

নমুনায়ন এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সমগ্রক সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় বা সমগ্রক সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সামাজিক গবেষণার অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আরোহ অনুমান বা তথ্যমূলক উপপত্তি (Statistical induction) বলে। সামাজিক গবেষণায় সমগ্রক সম্পর্কে এমন অনেক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যখন সমগ্র জনগোষ্ঠীর উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব।

সমগ্রক (Population)

সমগ্রক বলতে এক গুচ্ছ বস্তু বা এক দল লোক বুঝায়। সমগ্রক হলো একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেকগুলো উপাদান, বস্তু বা ব্যক্তির সমষ্টি। তাই সমগ্রক বলতে অনুসন্ধান ক্ষেত্রের সব বস্তুকে বুঝায়। যেমন : কত জমিতে এ বছরে ধান চাষ করা হয়েছে তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জরিপ কাজ পরিচালনা করতে যে-সব জমিতে এ বছরে ধান চাষ করা হয়েছে সেগুলোকে সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের গড় বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যাকে সমগ্রক হিসেবে ধরতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত জরিপের ক্ষেত্রে সব গ্রামের পরিবারের সংখ্যাকে সমগ্রক হিসেবে ধরা হবে। এ ধরনের আরো অনেক সমগ্রকের কথা উল্লেখ করা যায়। সমগ্রক যখন একটি নির্দিষ্টসংখ্যক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে সসীম সমগ্রক বলা হয়। যেমন : কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা, কোনো শহরের রিক্সাচালকের সংখ্যা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সমগ্রক যখন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে না তখন তাকে অসীম সমগ্রক বলে। অসীম সমগ্রকের ক্ষেত্রে সমগ্রকের অধীন মোট একক গণনা করা সম্ভব হয় না। তাই বলা

যায়, অসীম এককের আয়তন বা পরিমাণ অপরিমেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চাকতি নিক্ষেপের সমগ্রকের সংখ্যা অসীম, কারণ সীমাহীনভাবে চাকতি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। বাস্তব প্রেক্ষাপটে যখন দেখা যায় যে, সমগ্রকের আয়তন খুবই বড় তখন বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ধরে নেওয়া হয় যে, সমগ্রক অসীম।

নমুনা (Sample)

নমুনা হলো সমগ্রকের সেই বিশেষ অংশ যাকে অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করা হয়। অনুসন্ধানের জন্য যে-সব পর্যবেক্ষণ এককে নির্বাচন করা হয় সেগুলোকে 'নমুনা একক' বলে। এখানে 'নমুনা একক' এবং 'পর্যবেক্ষণ এককের' মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করা দরকার। সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত সব একক বা উপাদানকে পর্যবেক্ষণ একক এবং পর্যবেক্ষণ এককগুলো হতে অনুসন্ধানের জন্য যে এককগুলো নির্বাচিত হয় তাকে নমুনা একক বলে। অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নমুনাতে যে সমস্ত একক অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার সমষ্টিকে বলা হয় 'নমুনার আয়তন'। গবেষণাভেদে নমুনার আয়তন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দুই-ই হতে পারে। সাধারণভাবে নমুনা এককের সংখ্যা ৩০ বা তার কম হলে তাকে ক্ষুদ্রায়তনের নমুনা এবং ৩০-এর বেশি হলে তাকে বৃহদায়তনের নমুনা বলা হয়ে থাকে।

নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Method)

সমগ্রকের আওতাভুক্ত পর্যবেক্ষণ এককগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা একক নির্বাচন করার পদ্ধতিকে নমুনায়ন পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রক হতে নমুনা নির্বাচন করে উক্ত নমুনা হতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীকালে নমুনা হতে সংগৃহীত প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্যের ভিত্তিতেই সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ নমুনায়ন হলো নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি। নমুনায়ন পদ্ধতির আসল উদ্দেশ্য হলো সমগ্রক হতে নির্বাচিত একটি অংশের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে সমগ্রক সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করা। এভাবে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ একক পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বলে সমগ্রক সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, নির্বাচিত অংশটি অবশ্যই সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ হতে হবে। প্রতিনিধিত্বকারী অংশ নির্বাচনে গবেষক ব্যর্থ হলে নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত ফলাফলের ভিত্তিতে উপনীত সিদ্ধান্ত যথার্থ হবে না। নির্বাচিত নমুনার বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য সাধারণত গড়, মধ্যক, বিস্তার, পরিমিত ব্যবধান, পরিঘাত, বঙ্কিমতা, সহ-সংস্রব, নির্ভরণ ইত্যাদি পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বস্তুত নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রক সম্বন্ধে গবেষক কর্তৃক গৃহীত অনুমানসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিদ্যমান। সংখ্যাবহুলতা নমুনায়ন তত্ত্বের মূল ভিত্তি। সংখ্যাবহুলতা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, বহুসংখ্যক তথ্য সম্বলিত সমগ্রকের একাংশ স্বল্পসংখ্যক তথ্য এককের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য বা স্থায়ী। যেহেতু বহুসংখ্যক তথ্য তাদের চরম অবস্থাগুলো পরস্পরের মধ্যে লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করে, সেহেতু তাদের স্থায়িত্বের মাত্রা অনেক বেশি। তাই যদি গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত অধিকসংখ্যক পর্যবেক্ষণ এককের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন তবে গবেষণার ফলাফলের ক্ষেত্রে তাঁর অনুমানগত ত্রুটি তুলনামূলকভাবে কম হবে।

নমুনায়নের সিদ্ধান্ত

কোনো গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রক হতে নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী অংশবিশেষের উপর অনুসন্ধান পরিচালনা করা হবে কি-না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রধানত নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহের উপর নির্ভরশীল :

ক. সমগ্রকের আকার

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের আয়তন তুলনামূলকভাবে ছোট হলে নমুনা জরিপের চেয়ে সমগ্রক জরিপই যুক্তিযুক্ত। আর যদি সমগ্রকের আয়তন অনেক বড় হয় বা অসীম সমগ্রক হয় তবে সেক্ষেত্রে নমুনা জরিপ পরিচালনা করা অপরিহার্য।

খ. প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা

গবেষক যদি সমগ্রক থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা সংগ্রহের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হন তবে সেক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

গ. ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ

সমগ্র গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যদি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থবরাদ্দ থাকে তবে সেক্ষেত্রে সমগ্রক জরিপ পরিচালনা ব্যাহত হবে না। তাই যদি গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পথে অর্থসংক্রান্ত কোনো সমস্যা না থাকে তবে সমগ্রক জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অর্থবরাদ্দ অপেক্ষাকৃত কম হলে নমুনা জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়।

ঘ. সমগ্রকের প্রেক্ষাপট

কোনো সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি অসম প্রবণতা বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় তবে সেক্ষেত্রে সব উপাদানকেই পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সমগ্রক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ না করলে গবেষণার ফলাফলে ত্রুটির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

নমুনায়ন ভিত্তি (Base of Sampling Method)

সমগ্রক হতে এর প্রতিনিধিত্বকারী উপসমষ্টি বা অংশ নির্বাচন করার পদ্ধতিই হলো নমুনায়ন পদ্ধতি। সমগ্রক হতে নমুনা নির্বাচন করলে নির্বাচিত নমুনার প্রত্যেকটি একককে বলা হয় নমুনা একক। প্রতিটি নমুনায় দুই বা ততোধিক নমুনা একক থাকে। একটি নমুনা একক বিশিষ্ট নমুনা হতে সমগ্রক সম্বন্ধে ভিত্তিযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাই নমুনায়নের ভিত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নমুনা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে সেই নমুনা সংশ্লিষ্ট সমগ্রককে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ নমুনা গৃহীত হলে উক্ত ত্রুটিপূর্ণ নমুনা গবেষণার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা কোনো গবেষকেরই কাম্য নয়। তাই গবেষণা সম্পর্কিত সমগ্রকের ব্যাপারে নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের সময় নমুনায়নের ভিত্তিসহ নমুনায়ন কৌশল অবলম্বন করার দরকার হয়।

১. সমগ্রকের সমরূপতা (Homogeneity of Population)

কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য সমগ্রক থেকে যে নমুনা গৃহীত হয় তার বিভিন্ন অংশ বা এককের সাথে সেই বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সমগ্রকের সমরূপতার মাত্রা যত বেশি হবে অনুসন্ধানের ফলাফল তত বেশি বাস্তবতার কাছাকাছি যাবে। কিন্তু বাস্তবে একথা স্বীকার করা হয় যে, দুজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য থাকবেই। কিন্তু বিভিন্নতা বা অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে স্বল্প মাত্রায় কিছু ঐক্য বিদ্যমান তা খুঁজে বের করতে হবে এবং তাই-ই হবে নমুনায়নের ভিত্তি।

২. নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা (Representativeness of the Sample)

প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটি জনগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি অংশ বা কিছু একক বেছে নেওয়া সম্ভব। বেছে নেওয়া নমুনা বা এককগুলো সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের জন্য যত বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হবে নমুনা জরিপের ফলাফলও তত বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। তবে প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা খুঁজে বের করা সব ক্ষেত্রেই একেবারে সহজ ব্যাপার নয়।

৩. পূর্বানুমানের নির্ভুলতার মাত্রা (Level of Accuracy of Prediction)

সমীক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিতকরণের প্রাক্কালে গবেষকের ধারণা থাকতে হবে যে, তিনি যে সমীক্ষা পরিচালনা করবেন তার ফলাফল চরম বা ১০০% নির্ভুল না হলেও চলবে। তবে গবেষণা ক্ষেত্রে নমুনা নির্ধারণে গবেষক যত বেশি দক্ষতার পরিচয় দেবেন তাঁর পূর্বানুমানের নির্ভুলতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেক গবেষক ভুল তথ্য পরিহার করার একান্ত চেষ্টা করলেও বাস্তবে তা সম্পূর্ণ পরিহার করা যায় না। নমুনায়নের সমগ্রক যদি অতি ব্যাপক এবং সমীক্ষার বিষয় তুলনামূলকভাবে বেশি হয় তবে এই ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যুক্তিসঙ্গতভাবে নমুনা সংগ্রহ এবং অধিক নমুনা গ্রহণের মাধ্যমে এই ত্রুটির মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব।

নমুনায়নের সুবিধা (Advantage of Sampling)

সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের একটি ছোট অংশের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উক্ত সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটি পদ্ধতি হলো নমুনায়ন পদ্ধতি। এর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে 'সমগ্রক জরিপ' পদ্ধতি ব্যবহার হয়। সমগ্রক জরিপের তুলনায় নমুনায়ন পদ্ধতিতে কি কি সুবিধা বিদ্যমান তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের অংশবিশেষের গুণাবলি পরিমাপ করা হয় বিধায় এতে খরচ কম হয়। তাই এই পদ্ধতিতে মিতব্যয়িতার সুবিধা রয়েছে। নমুনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে সংগৃহীত তথ্যের সারণিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণের কাজে তুলনামূলক কম জনশক্তির দরকার হয়। ফলে এই পদ্ধতি পরিচালনায় খরচ কম লাগে। পক্ষান্তরে শুমারি জাতীয় বা সমগ্রক জরিপের ক্ষেত্রে সমগ্রকের প্রতিটি এককের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার দরকার হয় বলে অধিক জনশক্তির প্রয়োজন হয় এবং এতে খরচও বেশি লাগে।

২. এই পদ্ধতি গবেষণাকর্মে অনেক সময় বাঁচায়। সমগ্রকের একাংশের বিশেষ গুণাবলি পরিমাপ করা হয় বলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে

কম সময়ের দরকার হয়। দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে কোনো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি সম্পর্কে মন্তব্য করার দরকার হলে সেক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

৩. সমগ্রক জরিপের ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত বৃহৎ প্রশাসনিক কাঠামোর দরকার হয়। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রাহক, তথ্য সংগ্রাহকের তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিটি কর্মীর মাঝে সমন্বয়কারী কর্মকর্তার প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী সব সময় পাওয়া যায় না। তাই নমুনা জরিপ পদ্ধতিই বেশি সুবিধাজনক।

৪. সঠিকতার দিক দিয়ে নমুনা জরিপ সমগ্রক জরিপের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে। জরিপের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক লোক নিয়োজিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই বেশি সংখ্যক লোকের মধ্যে কাজের সমন্বয় হয়ে ওঠে না। ফলে জরিপের বিভিন্ন পর্যায়ে ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। উক্ত ভুল-ত্রুটির মাত্রা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুগুণে হ্রাস করা যায়।

৫. সমগ্রক পদ্ধতির আয়তন বিশাল থাকার কারণে প্রতিটি এককের উপর পর্যাপ্ত অনুসন্ধান সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। ফলে সমগ্রকের অনেক এককের বৈশিষ্ট্যই সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা হারায়। অপরপক্ষে নমুনা জরিপের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে প্রতিটি নমুনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে শ্রম ও সময় উভয়ই প্রদান করা হয়। ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে নিরূপিত হয়।

৬. এমন অনেক অনুসন্ধান আছে যেখানে কেবল নমুনা জরিপই প্রযোজ্য। যেসব ক্ষেত্রে এককের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হলো সেই এককে বিনষ্ট করা সেক্ষেত্রে সমগ্রক জরিপের প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভঙ্গুর প্রকৃতির দ্রব্যের উৎকর্ষ নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হলো নমুনা জরিপ।

৭. অনেক সময় একই বিষয়ে কিছুকাল অন্তর অন্তর জরিপ পরিচালনা করার দরকার হয়। যেমন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিষয়ে এর বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রগতি বিষয়ক জরিপ চালানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়ে তথ্য জানার জন্য যদি সমগ্রক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রতিবার প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং অত্যধিক সময় ও শ্রমের অপচয় হয়। এহেন অসুবিধার কারণে উক্ত বিষয়ে বার বার জরিপ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই যদি এ ক্ষেত্রে নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করে একাধিকবার তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহলে অত্যধিক শ্রম, অর্থ ইত্যাদি অপচয়ের সম্ভাবনা রোধ করা যায়।

নমুনায়নের অসুবিধা (Disadvantage of Sampling)

নমুনায়নের বহুবিধ সুবিধা থাকার কারণে এর জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে নমুনায়নকে একেবারে নির্ভেজাল কল্পনা করা ঠিক হবে না। বহুবিধ সুবিধার পাশাপাশি এই গবেষণা পদ্ধতিতে অল্পকিছু অসুবিধাও বিদ্যমান। আগেই বলা হয়েছে, নমুনা জরিপের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ভর করে সমগ্রকের সমরূপতা, নমুনার প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং নমুনায়নের পক্ষপাতহীনতার উপর। অথচ বাস্তবে

সমগ্রকের সব এককের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। তাই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা নির্বাচন করা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলেই নমুনা জরিপের ফলাফলকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। নিচে নমুনায়নের অসুবিধাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. নমুনা জরিপের মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে হলে অতি সাবধানতার সাথে জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একটু অসাবধান হলেই নমুনা জরিপের ফলাফল অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে।

২. নমুনা জরিপের ফলাফলের বিশুদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে জরিপে নিয়োজিত জনশক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর। জরিপ কাজে নিয়োজিত করার জন্য সবসময় সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির যোগান পাওয়া সম্ভব হয় না। এরই ফলে অদক্ষ জনশক্তি কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগ হেতু জরিপের ফলাফল হয় অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ।

৩. যে-ক্ষেত্রে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত জটিল এবং যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা নির্বাচনে সঙ্কট দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সমগ্রকের একটি বিশাল অংশকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করার প্রয়োজন হয়। এই বিশাল নমুনার উপর জরিপ পরিচালনার জন্য সময় ও অর্থ দুই-ই অত্যধিক পরিমাণে দরকার হয়। এহেন জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নমুনা জরিপ বাদ দিয়ে সমগ্রক জরিপ পরিচালনা করাই শ্রেয়।

৪. নমুনা জরিপের যে ক্ষেত্রে নমুনা বিচ্যুতি বেশি হয় সে ক্ষেত্রে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

৫. মানুষের পক্ষে বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সামাজিক প্রভাব ও সংস্কারমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই জরিপে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে নিজেকে জরিপ পরিচালনায় নিয়োজিত রাখতে পারে না। ফলে নমুনা নির্বাচনে ও নমুনার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণে তার পূর্বসংস্কার ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। এর ফলেই প্রথমে নমুনা জরিপের ফলাফল এবং পরবর্তীকালে গবেষণা সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়।

নমুনায়নের প্রকারভেদ (Type of Sampling)

নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক, নিরপেক্ষ ও প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য সংগ্রহ করতে হলে নমুনায়ন পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান থাকা অপরিহার্য। গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি, তথ্যের ধরন, বরাদ্দকৃত অর্থ ও সময়ের দিক বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট গবেষণা পরিচালনার জন্য নমুনা পদ্ধতিগুলোর মধ্য হতে উপযুক্ত একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়। অনেক সময় গবেষণার চাহিদা অনুযায়ী একাধিক নমুনায়ন পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গৃহীত পদ্ধতি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন নমুনায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা দরকার, তেমনি অন্যদিকে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য।

নমুনা নির্বাচনের প্রাথমিক পদ্ধতি হলো দুটি। যথা : সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability sampling) এবং নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-probability sampling)। সম্ভাবনা নমুনায়নকে আবার দৈবচয়িত নমুনায়নও (Random sampling) বলা হয়ে থাকে।

সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি (Probability Sampling)

সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক এককেরই যখন নমুনায়ন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে তখন তাকে সম্ভাবনা নমুনায়ন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব। নমুনায়ন পদ্ধতিতে সম্ভাবনা নমুনায়নই একমাত্র উপায় যার সাহায্যে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়। নমুনা থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সমগ্রকের সাথে কি পরিমাণ পার্থক্য সূচিত করে, অনুসন্ধানকারী তা সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনায়নের ত্রুটির মাত্রা বা বিচ্যুতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। আসলে সম্ভাবনা নমুনা পদ্ধতির ভিত্তি হলো দৈবায়ন (Randomization)। যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে এবং কোন কোন একক নমুনার অন্তর্ভুক্ত হবে তা সম্পূর্ণরূপ দৈবের উপর নির্ভরশীল, তাকে দৈবচয়িত নমুনায়ন বলে। এই পদ্ধতিতে সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিতিতে নমুনা নির্বাচন করা হয় এবং নমুনা নির্বাচন কেবল দৈবের উপর নির্ভরশীল থাকে। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণত দৈবচয়িত (Random) বলতে এলোপাথাড়ি বুঝায়। কিন্তু নমুনায়নের ক্ষেত্রে দৈবচয়িত শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। নমুনায়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে সংগৃহীত তথ্য পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতদুষ্টতা নিরসনকল্পে এই দৈবচয়িত নমুনায়ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমগ্রকের অন্তর্গত প্রতিটি এককের সমান সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এককগুলোর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করার সুযোগ দূরীভূত হয়। এজন্যই দৈবচয়িত নমুনায়ন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক।

সম্ভাবনা নমুনায়ন প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত :

১. সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন (Simple random sampling)
২. নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনায়ন (Systematic random sampling)
৩. স্তরিত নমুনায়ন (Stratified sampling)
৪. গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster sampling)

১. সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন (Simple Random Sampling) : সমগ্রকের প্রতিটি এককে অনপেক্ষভাবে সমান সম্ভাবনাসহ কোনো নমুনায় চয়ন করা হলে ঐ নমুনায়নকে সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন বলে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো একক নমুনায়ন অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না তা সম্পূর্ণরূপে দৈবের (chance) উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে সব এককের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে বিধায় নমুনা গ্রহণ কালে কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাতমূলক আচরণের সুযোগ থাকে না। গবেষকের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নমুনায়ন নির্ভর করে না এবং দৈবক্রমে নমুনা গ্রহণের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনা গ্রহণ করা হয়। সমগ্রকের এককগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সমগ্রকের প্রতিটি এককের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। কোনো প্রকার পক্ষপাতের সুযোগ না থাকায় এই পদ্ধতিকে আবার অবাধ দৈবচয়িত নমুনায়ন

(Unrestricted random sampling) নামেও অভিহিত করা হয়। আবার যেহেতু প্রত্যেকটি এককের নমুনায় নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে, সেহেতু অনেকেই একে Chance sampling-ও বলে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো সমগ্রকের মোট এককের সংখ্যা যদি ৪০০ হয় এবং তা থেকে যদি সরল দৈবচয়িত পদ্ধতিতে একটি নমুনা নির্বাচন করা হয়, তবে তার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হবে $\frac{১}{৪০০}$। আবার যদি উক্ত সমগ্রক থেকে ৪০টি এককে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হবে ($\frac{৪০ \times ১০০}{৪০০}$ = ১০) শতকরা ১০ ভাগ। দৈবচিত নমুনার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা। কিন্তু এই সমান সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় তখনই যখন প্রতিটি একক পরস্পর স্বাধীন বা অনির্ভরশীলভাবে (Mutually independent) নির্বাচিত হয়। কারণ, এককগুলো পরস্পর স্বাধীনভাবে নির্বাচিত না হলে সমগ্রকের কোনো উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্তির ফলে অন্য উপদানগুলোর নমুনায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ক্রমান্বয়ে অধিক মাত্রায় প্রভাবিত হতে থাকে। যেমন, ৪০০টি এককবিশিষ্ট একটি সমগ্রক হতে দৈবচিতভাবে যদি প্রথমে ১টি একক নির্বাচন করা হয়, তবে তার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{১}{৪০০}$। প্রথম এককটি নির্বাচনের পর যদি সমগ্রক থেকে উক্ত এককটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় এককটি নির্বাচন করা হয়, তবে ২য় এককটির নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হবে $\frac{১}{৩৯৯}$ এবং একইভাবে যদি ৩য় একক নির্বাচন করা হয় তবে সেক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা হবে $\frac{১}{৩৯৮}$। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, ১ম এককটি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ২য় এককটির সম্ভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে এবং ২য় এককটি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ৩য় এককটির সম্ভাবনা আরও বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ ১ম এককটির তুলনায় ২য় একটির এবং ২য় এককটির তুলনায় ৩য় এককটির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নমুনা নির্বাচনের এহেন প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপনবিহীন নমুনায়ন (Sampling without replacement) বলে। এভাবে প্রতিস্থাপনবিহীনভাবে নমুনা চয়ন করলে সমগ্রকের প্রতিটি উপদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সমান সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে বেশি মাত্রায় বিঘ্নিত হয়। তাই সমগ্রকের প্রতিটি উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্তির সমান সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিস্থাপনমূলক নমুনায়ন (Sampling with replacement) প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো একক নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে পরবর্তী একক নির্বাচনের সময় পূর্বের এককটি আবার সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে প্রতিটি এককেরই নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়। প্রতিস্থাপনমূলক প্রক্রিয়ায় নমুনা নির্বাচনের সব থেকে বড় অসুবিধা হলো এই যে, এ ক্ষেত্রে একবার নির্বাচিত এককের পুনর্বার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সমগ্রক বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট হলে এই সম্ভাবনার মাত্রা হ্রাস পায়। সামাজিক গবেষণার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিস্থাপন ছাড়াই নমুনা নির্বাচন করা হয়। সামাজিক গবেষণার গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের প্রতিটি এককে একটি করে নম্বর দিয়ে নম্বরগুলো ছোট ছোট কাগজে লিখে সেগুলোকে ভালোভাবে মেশাতে হয়। এরপর মেশানো কাগজগুলো হতে নমুনার সংখ্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাগজ দৈবচয়িতভাবে উত্তোলন করা হয়। উত্তোলিত কাগজগুলো থেকে প্রাপ্ত

নম্বরগুলো নমুনা হিসেবে গৃহীত হয়। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের আকার যদি বড় হয় এবং ব্যক্তিগত পক্ষপাত দূর করে লটারি প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায়, তাহলে সত্যিকার দৈবচয়নের কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়। অনেক গবেষণায় আবার দৈবচয়িত নমুনায়নের জন্য 'দৈব-সংখ্যা সারণি' (Random number table) ব্যবহৃত হয়। দৈব-সংখ্যা সারণিগুলো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয় এবং দৈবচয়ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। সারণিতে সংখ্যাগুলো কলাম ও সারিতে সাজানো হয় এবং এগুলোতে সমগ্রকের প্রতিটি একককে একটি করে ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হয়। সারণি হতে যে কোনো একটি পৃষ্ঠা বেছে নিয়ে তাতে সমগ্রকের আকারের সংখ্যার সাথে সংগতি রেখে একটি কলাম ও সারি নির্দিষ্ট করা হয়। নির্বাচিত সারি বা কলামের যে কোনো একটি সংখ্যা হতে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সংখ্যা পাওয়া যায় এবং এই সংখ্যাগুলোকেই নমুনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, নির্বাচনের সময় সমগ্রকের আকার বা আয়তন অপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যাকে বাদ দিতে হবে। একই সংখ্যা একের অধিকবার পাওয়া গেলে প্রথম নির্বাচন শেষে পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত একই সংখ্যাকেও বাদ দিতে হবে।

২. নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনায়ন (Systematic Random Sampling) : নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাপ্তি সহকারে দৈবচয়িতভাবে নমুনা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনায়ন বলা হয়। এই পদ্ধতিতে সমগ্রককে প্রথমত ভৌগোলিক, আঞ্চলিক,সংখ্যাক্রমিক অথবা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যানুসারে সজ্জিত করা হয়। এরপর সমব্যাপ্তিতে নমুনা এককসমূহ নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ব্যবস্থা অনুসারে সমগ্রকের অন্তর্গত প্রতিটি নমুনা এককে একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রথম এককটি প্রথম নমুনা ব্যাপ্তি হতে দৈবচয়িতভাবে নির্বাচন করা হয়। নমুনা ব্যাপ্তি দুটি নমুনা এককের মধ্যে গবেষক যে পরিমাণ ব্যবধান রাখতে চান তার পরিমাণ নির্দেশ করে। ব্যাপ্তির আয়তন নির্বাচিত সমগ্রকের আয়তন এবং নমুনার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক যে, ৭০০০ ব্যক্তি সম্বলিত সমগ্রক হতে গবেষক ৭০০ ব্যক্তিকে নমুনা একক হিসেবে নির্বাচন করতে চান। এ ক্ষেত্রে নমুনা ব্যাপ্তির আয়তন হবে ($\frac{৭০০০}{৭০০} = ১০$) ১০। অর্থাৎ বলা যায় যে, ১ম একক নির্বাচনের পর গবেষক প্রতি ১০ম এককে নমুনা একক হিসেবে নির্বাচন করবেন। এখন প্রথম ১০ জন ব্যক্তির মধ্য হতে দৈবচয়িত প্রণালি অনুসারে প্রথম নমুনা একক নির্বাচন করতে হবে। প্রথম এককটি অবশ্যই দৈবচয়িত পদ্ধতিতে নির্বাচন করা দরকার। কারণ এতে প্রতি এককেরই নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। ধরা যাক, দৈবচয়িত প্রণালির মাধ্যমে প্রথম নির্বাচিত এককটি হলো ৫ম ব্যক্তি। তাহলে ১৫তম ব্যক্তি হবে ২য় নির্বাচিত একক, ২৫তম ব্যক্তি হবে ৩য় নির্বাচিত একক। এভাবে ৬৯৯৫তম ব্যক্তি হবে ৭০০তম একক।

৩. স্তরিত নমুনায়ন (Stratified Sampling) : স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে প্রথমেই সমগ্রককে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগগুলোকে উপ-সমগ্রক (Sub-population) বা স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর প্রতিটি উপ-সমগ্রক থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা একক নির্বাচন করা হয়। উপ-সমগ্রকগুলোর অন্তর্ভুক্ত এককগুলোর মধ্যে অধিকতর সমরূপতা

(Homogeneity) আনয়নের উদ্দেশ্যে সমগ্রককে উপ-সমগ্রকে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন উপ-সমগ্রকের এককগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ অসমরূপতা বিরাজ করে। সরল দৈবচয়িত নমুনায়নের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, মোট সমগ্রক সমরূপতা বিশিষ্ট একটি শ্রেণী। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সমগ্রকটি অসমরূপতা বিশিষ্ট একটি শ্রেণী সে ক্ষেত্রে স্তরিত নমুনায়ন বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্তরিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রককে স্তর অনুসারে সাজানোর পর প্রতিটি স্তর হতে নমুনা নির্বাচন করা হয়। কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস করা হবে তা নমুনায়নের পূর্বেই নির্বাচন করার দরকার হয়। সাধারণত গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সমগ্রকের স্তর সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারণা লাভ করা যায়। গবেষককে স্তর বিভক্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। একই বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এককসমূহ যাতে একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এর অন্যথা ঘটলে স্তরীকরণ মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। একটি একক যেন কেবল একটি স্তরেই অন্তর্ভুক্ত হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। স্তরিত নমুনায়নের বিভিন্ন স্তর থেকে নমুনা নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রকার নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনাকালে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিসেবে স্তর বিন্যাস করা ; রাজনৈতিক গবেষণার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে স্তর বিন্যাস করা, ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে তাদেরকে বিভিন্ন জেলার বসবাসকারী হিসেবে স্তর বিন্যাস করা ইত্যাদি স্তরিত নমুনায়নের উদাহরণ।

সময় ব্যয় ও নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে স্তরিত নমুনায়ন সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক। যদিও সমগ্রকের স্তর বিন্যাসে প্রথম দিকে একটু বেশি সময় লেগে যায়, তথাপি তথ্য সংগ্রহের বেলায় সময় খুবই কম লাগে। সমআয়তন বিশিষ্ট নমুনার ক্ষেত্রে অনেক সময় স্তরিত নমুনায়ন সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন অপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

৪. **গুচ্ছ নমুনায়ন** (Cluster Sampling) : গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসারে প্রথমেই সমগ্রককে কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীকে এক একটি গুচ্ছ (Cluster) বলা হয়। এই নমুনায়ন পদ্ধতিতে গুচ্ছগুলোকেই নমুনা একক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। গুচ্ছগুলো এমনভাবে করা হয়, যাতে প্রতি গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত এককগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় অসমরূপতা বিরাজ করে এবং বিভিন্ন গুচ্ছের মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় সমরূপতা বিরাজ করে। গুচ্ছায়নের উদ্দেশ্য স্তর বিন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। গুচ্ছায়নের পর অবাধ দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নমুনা একক অর্থাৎ গুচ্ছ নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীকালে নির্বাচিত গুচ্ছগুলো থেকে গবেষণার জন্য প্রযোজ্য তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে গুচ্ছ চয়ন করা হয় বলে গুচ্ছ চয়ন পদ্ধতিকে আবার ক্ষেত্র নমুনায়নও (Area sampling) বলা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কোনো বিশাল এলাকাকে বিভিন্ন মহল্লায় ভাগ করলে প্রতি মহল্লায় বেশ কিছুসংখ্যক পরিবারের গুচ্ছে পরিণত হবে। এ পর্যায়ে প্রতিটি গুচ্ছকে ধারাবাহিকভাবে স্বতন্ত্র নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর অবাধ দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সংখ্যক গুচ্ছ নির্বাচন করা যাবে। এই নির্বাচিত মহল্লাগুলোর প্রত্যেকটির

অন্তর্গত সব পরিবারের তালিকা তৈরি করে তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে নির্বাচিত প্রতিটি গুচ্ছ থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলির ভিত্তিতে সমগ্রক সম্পর্কে সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এই গুচ্ছ নমুনায়নের সুবিধা এই যে, এতে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বিস্তারিতভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। গুচ্ছসমূহ দৈবচয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার কারণে সেগুলো পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। গুচ্ছ নমুনায়নের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, গুচ্ছসমূহের আয়তন বৃদ্ধি করলে অনুসন্ধান ব্যয় হ্রাস পায় বটে ; কিন্তু নমুনা বিচ্যুতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর প্রধান কারণ হলো গুচ্ছের আয়তন বৃদ্ধি করে সঠিক গুচ্ছায়ন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই এই পদ্ধতিতে গুচ্ছসমূহের আয়তন নির্ধারণের সময় নমুনা বিচ্যুতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়।

নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-Probability Sampling)

যে সব ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না, সে সব ক্ষেত্রে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। নমুনায়ন তিন প্রকার। যথা :

১. আনুমানিক অংশ নমুনায়ন (Quota Sampling)
২. আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental Sampling)
৩. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling)

১. **আনুমানিক অংশ নমুনায়ন** (Quota Sampling) : আনুমানিক অংশ নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের আওতাভুক্ত বিভিন্নমুখী উপাদানগুলোকে আনুপাতিক হারে নমুনায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি এক ধরনের বিচার্য নমুনায়ন। এই পদ্ধতিতে সমগ্রকের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের উপাদানের একটি বিচার্য অংশ নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক গবেষক সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নমুনার একটি কোটাভিত্তিক বণ্টন পূর্বেই নির্দিষ্ট করে ফেলেন যেখানে সমগ্রকের বিভিন্ন ধরনের উপাদানই একটি আনুপাতিক হারে স্থান পায়। ফলে এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়া বহাল থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত এককগুলোর নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমান সম্ভাবনা থাকে না। কারণ আনুপাতিক অংশ নমুনা দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত হয় না। প্রতিটি উপ-সমগ্রক বা স্তরের যে-সব উপাদান সহজলভ্য তাদেরকেই একটি আনুপাতিক হারে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, টিভি দর্শকদের উপর একটি জরিপ পরিচালনার জন্য একজন গবেষক শ্রোতাদের থেকে নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে স্থির করলেন যে, তিনি মোট ১০০০ নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তিনি আরো স্থির করলেন যে, এই ১০০০ জনের প্রতি ১০০ নমুনার মধ্যে ৪০ জন থাকবে চাকুরিজীবী, ৩০ জন থাকবে ব্যবসায়ী, ২০ জন থাকবে গৃহিণী ও বাকি ১০ জন থাকবে ১৫ বছরের নিচের ছেলেমেয়ে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কোটার মধ্য থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যে কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি যদি উত্তর প্রদানে অসম্মতি জানান তাহলে পরবর্তী যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোনো ব্যবসায়ী যদি বাসায় না থাকেন তবে পরবর্তী যে কোনো ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধা থাকবে না। আবার যে-সব গৃহিণীকে বাসায় পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকেই তথ্য গৃহীত

হবে। যাদের বাসায় পাওয়া গেল না তাদের সাক্ষাৎকারের যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল এমনটি নয়।

কোনো সমগ্রকের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতি দ্রুত মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য আনুপাতিক অংশ নমুনা খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে, স্বল্প শ্রমে ও তুলনামূলক কম খরচে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। অন্য যে কোনো নিঃসম্ভাবনা নমুনার চেয়ে এ পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু একথা স্বীকৃত যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান খুবই নিচু। তাই এ পদ্ধতি অনুসন্ধানমূলক অনুধ্যান (Exploratory study) বা অগ্রবর্তী জরিপ (Pilot survey)-এর জন্য উপযোগী হলেও প্রকৃত অর্থে গবেষণা বলতে যা বুঝায় তার জন্য আদৌ ব্যবহারযোগ্য নয়। এ পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারী তাঁর পূর্বতন ধারণা দ্বারা তাড়িত হয়ে পুরো অনুমানকে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়া নমুনায়ন প্রক্রিয়াটি দৈবচয়িত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয় বিধায় এর নমুনা বিচ্যুতি পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

২. **আকস্মিক নমুনায়ন** (Accidental Sampling) : আকস্মিক নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক সম্ভাবনা তত্ত্বের কোনো নিয়মই অনুসরণ করেন না। এই পদ্ধতিতে গবেষক তাঁর গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচলিত বিশেষ কোনো পদ্ধতির স্মরণাপন্ন না হয়ে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সমগ্রকের মধ্যে সামনে যেটি পান সেটিকেই নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এভাবেই সব নমুনা সংগৃহীত হয়। এ পদ্ধতিতে গৃহীত নমুনার কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে না। আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত নমুনা চয়ন করতে করতে গবেষক যখন মনে করেন যে, প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট আয়তনে পৌঁছেছে, তখনই তিনি নমুনা-একক গ্রহণ করা বন্ধ করেন। এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া এহেন নমুনা থেকে সংগৃহীত তথ্যের পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। তাই বলা যায়, আকস্মিক নমুনায়ন পদ্ধতি একটি অত্যন্ত অশোধিত (Crude) নমুনায়ন পদ্ধতি। কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে একেবারে ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর না করে অল্প কিছু তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান গ্রহণ করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কোনো দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে দ্রুত অনুমান গ্রহণের জন্য এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মতামত জরিপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাংবাদিক দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনার জন্য শহরের ব্যস্ততম এলাকা, স্টেশন, হাট-বাজার ইত্যাদি স্থান থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক লোকের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের মনোভাব, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে জনমত যাচাই করার একটি দ্রুততম পন্থা হিসেবে এই নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৩. **উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন** (Purposive sampling) : উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তত্ত্বের ব্যবহার করা হয় না। এ ক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনকারী স্বীয় পছন্দ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে নমুনা নির্বাচন করতে

প্রয়াস পান। নমুনা নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচনকারীর বিচার-বুদ্ধি বিশেষভাবে কাজ করে বিধায় একে বিচার নমুনায়নও বলা হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীর সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট সমগ্রকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বকারী এককগুলোকে নমুনায় অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয় বিধায় একে উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এই নমুনায়ন যাতে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট না হয় সে জন্য গবেষক বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে এবং সুকৌশলে নমুনা চয়ন সম্পাদন করেন। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একক নির্বাচনে তৎপর থাকেন।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নে সম্ভাবনা তত্ত্বের অভাবহেতু সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য নিরূপকের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয় না। ছোট আয়তনবিশিষ্ট নমুনা নির্বাচনে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্তিপূর্ণ; কারণ এতে নমুনা বিচ্যুতি বৃদ্ধি পায় না। অথচ ছোট নমুনার ক্ষেত্রে দৈবচয়িত নমুনায়নের নমুনা বিচ্যুতি অত্যধিক। অন্যান্য নিঃসম্ভাবনা নমুনার মতোই উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির সাহায্যে যে কোনো সম্ভাবনানির্ভর নমুনার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম খরচে ও কম সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এছাড়াও উক্ত পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বকারী এককসমূহের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
PROCESSING OF DATA

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকালে গবেষক একদল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগ করেন। কারণ গবেষক নিজে উপস্থিত থেকে সব সময় উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন না। সে কারণেই উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের পূর্বে তা নিরীক্ষা করে দেখার বিশেষ প্রয়োজন থেকে যায়। সংগৃহীত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পন যাচাই এবং গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের সুশৃঙ্খল, বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা দান, কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়, অনুমান যাচাই এবং তত্ত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের সুবিধার্থে তথ্যগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত করা হয়। একেই বলা হয় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য গবেষণার সমস্যা ও অনুমানের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যকে মূল্যায়ন করা হয় এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। তথ্যের আকার যদি বৃহৎ এবং ব্যাপক হয় তবে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ নির্ভুল ও সহজ হয়। তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপ মোট তিনটি। যথা :

১. প্রশ্নমালা ও অনুসূচির সম্পাদনা (Editing of the questionnaire and schedule)
২. সংকেতায়ন (Coding)
৩. শ্রেণীবদ্ধকরণ (Classification)

১. প্রশ্নমালা ও অনুসূচির সম্পাদনা (Editing of the Questionnaire and Schedule) তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রথম কাজ হলো পূরণকৃত প্রশ্নমালা ও অনুসূচিগুলো বাছাই করা ও সম্পাদনা করা। ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিমাণ হ্রাস, বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিভিন্ন উত্তরের মধ্যে সংগতি বজায় আছে কিনা তা নিরীক্ষা ইত্যাদি কাজকে সম্পাদনা বলা হয়ে থাকে।

তথ্য বিশ্লেষণের আগে প্রতিটি প্রশ্নমালা বা অনুসূচি পূর্ণ ও সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার দরকার হয়। অসম্পূর্ণ প্রশ্নমালা বা অনুসূচি ব্যবহারের অনুপযোগী বিধায় সেগুলোকে বাছাই করে বাদ দিতে হবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর সন্দেহজনক মনে হলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সহায়তায় তা সন্দেহমুক্ত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য আবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রশ্নমালা ফেরত পাঠিয়ে পুনরায় তা যথাযথভাবে পূরণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

২. সংকেতায়ন (Coding)

সংকেতায়ন হলো তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বিতীয় ধাপ। প্রশ্নমালা বা অনুসূচির উত্তরগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক আকৃতি দানের পূর্বেই উত্তরগুলোকে সংকেতায়ন করা হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকালে যদি বিভিন্ন প্রশ্নে সাংকেতিক নম্বর প্রদান না করা হয়, তবে প্রক্রিয়াজাতকরণ কালে গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রশ্নগুলোতে সাংকেতিক নম্বর দিতে হয়। সারণির মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপনের সময় প্রদত্ত সাংকেতিক নম্বর অনুযায়ী সারণিতে তথ্য উপস্থাপিত হয়। সাংকেতিক নম্বর ব্যবহারের ফলে বড় বড় প্রশ্ন বা উত্তর বার বার লেখার ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ লা করা যায়। বর্তমানে প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরগুলোকে সংকেতায়নের দ্বারা কম্পিউটার সেগুলোকে অতি সহজে ও কম সময়ে নির্ভুলভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত Software-গুলোর মধ্যে SPSS for Windows সবার শীর্ষে। SPSS–এর মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কাজগুলো অতি সহজে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব :

* Computing Values
* Counting Occurrences
* Recording Values
* Ranking Data
* Sorting Data
* Selecting a Random Sample
* Selecting a Random of Dates or Times
* Weighting Cases etc.

৩. শ্রেণীবদ্ধকরণ (Classification)

শ্রেণীবদ্ধকরণ হলো কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তথ্যকে সজ্জিত করার প্রক্রিয়া। এসব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তথ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধকরণের ফলে একই বৈশিষ্ট্যসম্বলিত তথ্যগুলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তথ্যসমূহ শ্রেণীবদ্ধকরণের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য এবং প্রতিটি তথ্যের কোনো না কোনো শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি এলাকার কর্মক্ষম লোকদের তাদের বিভিন্ন পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলো। এখানে চাকুরিজীবীদের একটি শ্রেণীতে, ব্যবসায়ীদের আর একটি শ্রেণীতে, এভাবে কৃষক, গৃহিণী, ছাত্র, বেকার ইত্যাদি শ্রেণীতে তাদেরকে বিভক্ত করা হলো। শ্রেণীবদ্ধকরণের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানগুলো যেন একই বিভাগ বা একই শ্রেণীভুক্ত থাকে। শ্রেণীবদ্ধকরণ বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নানা ধরনের তথ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক তুলনার পথকে সুগম করে। ফলে তথ্যসমূহের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শ্রেণীবদ্ধকরণ তথ্যসমূহকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ শেষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। শ্রেণীবদ্ধকরণের সময়

লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে সব তথ্যই কোনো না কোনো শ্রেণীর আওতাভুক্ত হতে পারে। তথ্যের আংশিক শ্রেণীবদ্ধকরণ করা সমীচীন নয়। কারণ এতে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার একই তথ্য যেন একের অধিক শ্রেণীভুক্ত না হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। একই তথ্য একের অধিক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করলে শ্রেণীবদ্ধকরণের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়।

শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি (Basis of Classification)

তথ্যের যে সব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তথ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তাকে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি বলে। তথ্যের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্নভাবে করা যায়। শ্রেণীবদ্ধকরণের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তথ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্পাদিত হয়। যেমন :

১. **সময়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ** (Time-Basis Classification) : সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন চলকের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই সময়ের ভিত্তিতে উক্ত চলকসমূহকে শ্রেণীবিভাগ করলে তাকে সময়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ বলা হবে। এ ক্ষেত্রে সময়ের পার্থক্যজনিত কারণে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করা অত্যধিক সহজ হয়। বিভিন্ন সময়ে দেশের মোট জাতীয় আয়, আমদানি ও রপ্তানি, লোকসংখ্যা, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি প্রদর্শন করতে সময়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। নিচে সময়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ১২.১ : ১৯৮৫-৯৪ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত লোকদের সংখ্যা।

বছর	কর্মরত লোকের সংখ্যা
১৯৮৫	২৭৭৭
১৯৮৬	৩৫১৫
১৯৮৭	৪৪১২
১৯৮৮	৬৮৯৩
১৯৮৯	৮৪৪৯
১৯৯০	১১৯৬৪
১৯৯১	১০৯০৪
১৯৯২	১০৫৩১
১৯৯৩	১০৪৯৯
১৯৯৪	১০৮৬১

উৎস : গ্রামীণ ব্যাংক

২. **পরিমাণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ** (Quantitative-basis Classification) : তথ্যের সংখ্যাসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিমাণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীবিভাগে দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য হলো পরিমাণ। ওজন, মূল্য, দৈর্ঘ্য, আয়তন, খরচ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিত পরিমাপ এককের উপর এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ নির্ভরশীল। তথ্যসমূহকে কিভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে তা ঐ তথ্যের প্রকৃতিই নির্ধারণ করে। পরিমাণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক পরিসীমার দ্বারা শ্রেণীগুলোকে আলাদা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করার সময় নিম্নলিখিতভাবে বয়সশ্রেণী তৈরি করা যায় :

১০ বছরের নিচে, ১০ থেকে ১২ বছরের নিচে, ১২ থেকে ১৪ বছরের নিচে, ১৪ থেকে ১৬ বছরের নিচে ১৬ বছর এবং তার উর্ধ্বে।

৩. **গুণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ** (Qualitative-Basis Classification) : তথ্যের মধ্যে নিহিত বিশেষ গুণের উপর এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে। বিশেষ গুণ বলতে সেইসব বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য বুঝায় যার সংখ্যাভিত্তিক পরিমাপ সম্ভব নয়। কোনো বস্তু বা ব্যক্তি কোনো একটি বিশেষ গুণের অধিকারী কিনা সেই তথ্যানুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বিশেষ কোনো একটি গুণের নিরিখে বিচার করলে অতি সহজেই একটি সমগ্রককে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বিভক্ত দুটি শ্রেণীর একটির মধ্যে ঐ বিশেষ গুণটি বিদ্যমান এবং অপর শ্রেণীর মধ্যে তা অবর্তমান থাকে। একটি বিশেষ গুণের ভিত্তিতে কোনো জনসংখ্যাকে দু'ভাগে বিভক্ত করলে দ্বিমুখী শ্রেণীবিভাগ (Dichotomous classification) লাভ করা যায়। আবার, একাধিক গুণানুসারে একই জনসমষ্টিকে অসংখ্য শ্রেণীতে ভাগ করলে বহুধা বা বহুমুখী শ্রেণীবিভাগ (Manifold classification) লাভ করা যায়। নিচে দ্বিমুখী ও বহুমুখী শ্রেণীবিভাগের উদাহরণ দেওয়া হলো :

দ্বিমুখী শ্রেণীবিভাগ

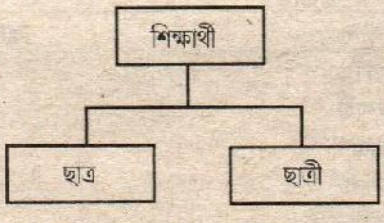

বহুমুখী শ্রেণীবিভাগ

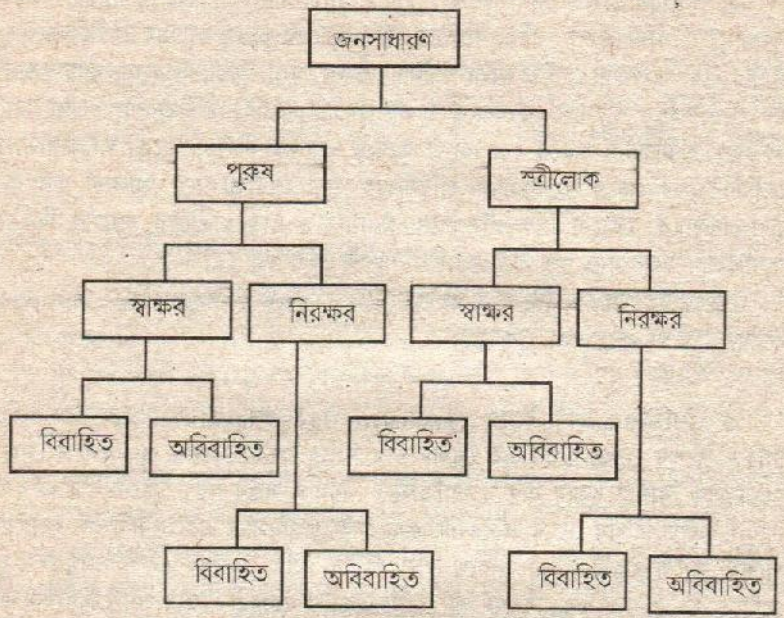

৪. **ভৌগোলিক অবস্থানভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ** (Geographical Location-basis Classification) : সামাজিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যসমূহকে অনেক সময় ভৌগোলিক অবস্থান বা স্থানের ভিত্তিতে সংখ্যাতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগ বস্তু বা ব্যক্তির স্থানবিশেষ বিস্তৃতি নির্দেশ করে। বাংলাদেশের আদম শুমারির তথ্য উপস্থাপনের জন্য বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম, শহর প্রভৃতিকে ভিত্তি করে দেখানো সম্ভব। আন্তর্জাতিকভাবে কোনো তথ্য দেখানোর জন্য তথ্যকে জাতীয় সীমানার ভিত্তিতে ভাগ করে তা প্রদর্শন করা হয়। নিচে ভৌগোলিক অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ১২.২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে ১৯৯৬ সালে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার (মেট্রিক টন)

বিভাগ	জ্বালানী কাঠ
ঢাকা	৫১০
রাজশাহী	৪৯০
খুলনা	৪৮০
বরিশাল	৩৮৩
চট্টগ্রাম	৩৭২
সিলেট	৩১০

উৎস : কাল্পনিক

শ্রেণীবদ্ধকরণ গবেষণার উদ্দেশ্য ও তথ্যের প্রকৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। তাই এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে বেশি কিছু বলা যায় না। অধিকাংশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেই শ্রেণীবদ্ধকরণের প্রণালি ও প্রক্রিয়া ঠিক করা হয় তথ্য সংগ্রহ করার পূর্বেই এবং এই নির্ধারিত প্রণালি ও প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে সব ক্ষেত্রে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণের সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, সে সব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা শেষে শ্রেণীবদ্ধকরণের ভিত্তি নির্ণয় করা হয়। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজ শুরু করার পূর্বেই শ্রেণীবদ্ধকরণের ভিত্তি ও প্রণালি সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয়।

পংক্তিতে সাজানো

সংগৃহীত তথ্য যদি তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় অল্প হয় তবে তাদেরকে বিশ্লেষণের জন্য সারসংক্ষেপ না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে কোনো একটি ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিলেই চলে। এভাবে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে সাজানোর ফলে তাদের পরিমাণ বা মাত্রার ক্রমানুযায়ী একটি পংক্তির সৃষ্টি হয়। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে তাদের মানের উচ্চক্রম বা নিম্নক্রম অনুসারে সাজিয়ে বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী করে তোলা যায়। নিচে এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া হলো :

অপর পৃষ্ঠায় তথ্যগুলো একটি গ্রামের ৩০টি পরিবারের মাসিক আয় নির্দেশ করে। তথ্যগুলোকে মানের উচ্চক্রম ও নিম্নক্রম অনুসারে সাজানো যায়।

৮৫০, ১৭২০, ৯৮২, ৬৩০, ৪২৫, ৮২৮, ৫০৯, ৪০৩, ৫৪০, ২৫২৮, ২০৩০, ১৬১৬, ১৫০৮, ১২৩০, ১১৩০, ১০১৫, ৯৩০, ১৩২৮, ২৪৩০, ২৯৮০, ২২০৭, ২৮১৮, ২৩২৫, ২১৯০, ২২৬০, ১৭৩০, ১৫৭০, ২৩২৪, ১৮২০, ১৪৮০।

মানের নিম্নক্রম অনুসারে সাজানো তথ্য

৪০৩	১৫৭০
৪২৫	১৬১৬
৫০৯	১৭২০
৫৪০	১৭৩০
৬৩০	১৮২০
৮২৮	২০৩০
৮৫০	২১৯০
৯৩০	২২০৭
৯৮২	২২৬০
১০১৫	২৩২৪
১১৩০	২৩২৫
১২৩০	২৪৩০
১৩২৮	২৫২৮
১৪৮০	২৮১৮
১৫০৮	২৯৮০

মানের উচ্চক্রম অনুসারে সাজানো তথ্য

২৯৮০	১৫০৮
২৮১৮	১৪৮০
২৫২৮	১৩২৮
২৪৩০	১২৩০
২৩২৫	১১৩০
২৩২৪	১০১৫
২২৬০	৯৮২
২২০৭	৯৩০
২১৯০	৮৫০
২০৩০	৮২৮
১৮২০	৬৩০
১৭৩০	৫৪০
১৭২০	৫০৯
১৬১৬	৪২৫
১৫৭০	৪০৩

এই পদ্ধতিতে তথ্যসমূহকে একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে সজ্জিত করা হয় মাত্র। এ ক্ষেত্রে তথ্যসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত না করেই সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। তথ্যসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার এই ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ফল প্রদান করে। কিন্তু গবেষণাভিত্তিক অধিকাংশ পরিসংখ্যানিক তথ্যই কলেবরের দিক দিয়ে অনেক বড় হয়। তাই সেগুলোকে কোনো না কোনোভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অন্যথায় বৃহৎ কলেবরবিশিষ্ট তথ্যসমূহের তাৎপর্য সহজবোধ্য হয়ে ওঠে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
তথ্য উপস্থাপন
PRESENTATION OF DATA

জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য থেকে গবেষক বা অনুসন্ধানকারী খুব সামান্যই উপকৃত হয়ে থাকেন। কারণ এহেন তথ্যস্তূপের সাহায্যে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। প্রাথমিক অবস্থায় সংগৃহীত তথ্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বৃহৎ কলেবরবিশিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গবেষকের জন্য একটি কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সারণিবদ্ধকরণ ও বিভিন্ন রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনের ফলে সংগৃহীত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা সহজসাধ্য হয়।

সারণিবদ্ধকরণ (Tabulation)

সারণিবদ্ধকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণীবদ্ধকরণ হলো সারণিবদ্ধকরণের প্রথম ধাপ। সারণি প্রস্তুতের পূর্বে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিষয় বা বস্তুগুলো এক একটি শ্রেণীতে আলাদা আলাদাভাবে সজ্জিত করতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এরই ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সারণি বা ছকের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ তথ্যগুলোকে উপস্থাপন করা হয়। সারণিবদ্ধকরণের ফলে তথ্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। সারণি ব্যবহারের ফলে তথ্যের উপস্থাপনের কাজ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয় এবং সারণি তথ্যসমূহের পারস্পরিক তুলনার পথকে সুগম করে।

সারণির অংশসমূহ

প্রত্যেক সারণিই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। নিচে সারণির অংশগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. শিরোনাম (Title)

প্রত্যেক সারণির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট শিরোনাম থাকতে হবে যার মধ্য দিয়ে সারণির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ পাবে। শিরোনাম যথাযথ ও সহজ হওয়া দরকার। শিরোনাম এক নজরে পাঠককে সারণির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হয়। কখনো কখনো সারণির শীর্ষে উপ-শিরোনামও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপ-শিরোনাম মূল শিরোনামেরই ব্যাখ্যা প্রদানকারী অংশ হিসেবে কাজ করে।

খ. কলাম শিরোনাম (Column Head)

কলাম শিরোনাম সারণির বিভিন্ন কলামে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকারী অংশ হিসেবে কাজ করে। একটি সারণিতে যতগুলো কলাম থাকে তার প্রত্যেকটি কলামের অন্তর্গত তথ্যের বর্ণনাসম্বলিত একটি শিরোনামের দরকার হয়। সারণিতে উপ-কলামের ব্যবহার থাকলে উপ-কলাম শিরোনামও দেওয়া হয়।

গ. স্টাব বা রো-শিরোনাম (Stub)

স্টাব হলো রো-হেডিং। স্টাবের অবস্থান সারণির সর্ববামে। ইহা কলাম শিরোনামের মতোই কাজ করে। স্টাবের দুটি অংশ থাকে। যথা : স্টাব-শীর্ষ ও স্টাব-বিবৃতি। স্টাব-শীর্ষের কাজ হলো স্টাবের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া। আর স্টাব-বিবৃতি উপাত্তের শ্রেণীবিভাগের সত্যিকার পরিসীমাগুলো নির্দেশ করে।

ঘ. বিষয়বস্তু (Subject Matter or Body)

সারণির বিষয়বস্তুতে সংগৃহীত উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত থাকে। সারণির এ অংশে কলাম শিরোনাম ও স্টাব অনুযায়ী তথ্যসমূহ পরিবেশিত হয়। সংখ্যাবাচক তথ্যগুলো সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তুতে পর্যাপ্ত স্থান রাখার দরকার হয়। বিভিন্ন স্তম্ভে বিষয়বস্তু সম্বলিত তথ্যসমূহ সাজানোর ব্যাপারে যৌক্তিকতা থাকা দরকার।

ঙ. পাদটীকা (Footnote)

সারণির অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা একটি বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে সারণির ঠিক নিচে লিখতে হয় এবং ঐ বিশেষ চিহ্নটি ব্যাখ্যার পাশেও প্রদান করতে হয়। একাধিক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের দরকার হলে একই রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে তা সম্পাদন করা উচিত।

চ. তথ্যের উৎস (Source of Data)

গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য যদি প্রাথমিক (Primary) না হয় তবে তা কোন উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে তা পাদটীকার নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। সারণির অংশ হিসেবে তথ্যের উৎস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি উৎসাহী পাঠককে মূল তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করে। সারণির এই অংশে উৎসসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ছ. সারণির সংখ্যা (Table Number)

প্রকৃতপক্ষে সারণি সংখ্যা সারণির কোনো অংশ নয়। একই গবেষণা প্রতিবেদনে যদি একাধিক সারণি ব্যবহৃত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সারণিগুলো শনাক্তকরণের সুবিধার্থে সারণি সংখ্যা বা সারণি নম্বর প্রদান করা হয়। এই নম্বর সাধারণত সারণির উপরে শিরোনামের বাম দিকে দেওয়া হয়। একাধিক কলামবিশিষ্ট সারণির কলামগুলো সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে প্রত্যেক কলামের নম্বর প্রদানের রীতিও প্রচলিত আছে।

নিম্নে একটি সারণির বিভিন্ন অংশের উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ১৩.১ : সারণির বিভিন্ন অংশ

শিরোনাম

(উপ-শিরোনাম)

স্টাব-শীর্ষ	কলাম শিরোনাম		
	উপ-কলাম শিরোনাম	উপ-কলাম শিরোনাম	উপ-কলাম শিরোনাম
স্টাব-বিবৃতি	↑ ←——বিষয়বস্তু——→ ↓		

পাদটীকা :

তথ্যের উৎস :

সারণি তৈরির নিয়মাবলি

যে কোনো গবেষণাতেই সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ সারণি প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য গবেষণা প্রক্রিয়ায় সারণির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারণি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তেমন নিয়ম-কানুন নেই। কারণ সারণি শুধু এক প্রকার নয় এবং গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সারণি প্রস্তুত করা হয়। তবে একথা সত্য যে, যথোপযুক্ত সারণি তৈরির জন্য দীর্ঘদিনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্যের বিকল্প নেই। তথাপি সারণি প্রস্তুতের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম-নীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলে সারণির গুণগত মান উৎকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১. যতদূর সম্ভব সারণি সহজ-সরল ও বোধগম্য করে তৈরি করতে হবে। খুব বেশি জটিলতা সারণি তৈরির উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে। একই সারণিতে বিপুল পরিমাণ তথ্যের সমাবেশ ঘটানো ঠিক নয়। তথ্যসমূহ জটিল এবং আয়তনের দিক দিয়ে বৃহৎ হলে যতদূর সম্ভব উপাত্তকে কতকগুলো সহজ সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ব্যবহারকারীর সুবিধাজনক দিকগুলোর প্রতি নজর রেখে সারণি তৈরি করা উচিত।

২. সারণি তৈরির পূর্বে একটি প্রতিরূপ সারণি তৈরি করে নেওয়া ভালো। প্রতিরূপ সারণি মূল সারণির আয়তন, গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বধারণা দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে মূল সারণি তৈরির ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটির পরিমাণ হ্রাস পায়।

৩. সারণি প্রস্তুতের সময় এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের দরকার হয়। কলামগুলো ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হওয়া ঠিক নয়।

৪. সারণিতে পরিমাপের একক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একই কলামে ভিন্ন ভিন্ন এককের ব্যবহার থাকা ঠিক নয়।

৫. সারণির শিরোনাম তার বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিরোনামের অবস্থান সারণির উপরে ঠিক মাঝখানে হওয়া দরকার।

৬. পরস্পর তুলনাযোগ্য কলামগুলো তুলনার সুবিধার্থে পাশাপাশি অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়।

৭. সারণির আয়তন খুব বেশি বড় হওয়া উচিত নয়। এর আয়তন এমন হওয়া দরকার যাতে পাঠকের পক্ষে একদৃষ্টিতে সারণির বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হয়।

৮. সারণিতে ব্যবহৃত যাবতীয় বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা থাকা উচিত। সারণিতে 'ইত্যাদি', 'এধরনের', 'এজাতীয়' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। যে-সব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি সে-সব ক্ষেত্রে শূন্য না বসিয়ে 'পাওয়া যায় নি' অথবা ড্যাস (—) চিহ্ন ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে।

সারণিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক গবেষণায় সারণিবদ্ধকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ সামাজিক গবেষণা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়। সারণিবদ্ধকরণ ব্যতিরেকে এই বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে তেমন কোনো কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। সারণিবদ্ধকরণ বিপুল পরিমাণ তথ্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে যার মধ্য দিয়ে উপাত্তের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিস্ফুটিত হয়। নিচে সামাজিক গবেষণা ক্ষেত্রে সারণি ব্যবহারের সুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো :

* সারণিবদ্ধকরণের ফলে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশদীকরণ এবং পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
* সারণি বহুসংখ্যক তথ্যের সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। তাই সারণি সারসংক্ষেপের মাধ্যমে বহুসংখ্যক ঘটনার পর্যালোচনায় সাহায্য করে।
* এটি বহুসংখ্যক তথ্যকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিস্ফুটিত করে।
* সারণির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় বা তুলনা করা সম্ভব হয়।
* সারণিতে উপস্থাপিত উপাত্তগুলোর গড়, অনুপাত, শতকরা হার প্রভৃতি গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বিধায় সেগুলোর বিশ্লেষণ করা সহজ হয়।
* সারণিতে উপস্থাপিত উপাত্তগুলো পাশপাশি অবস্থান করে বলে বিভিন্ন চলকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি খুবই উপযোগী।
* সারণিতে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয় বলে পাঠকের পক্ষে তা অতি অল্প সময়ে বুঝে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হয়।

সারণির আকার

সারণির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সারণি একমুখী, দ্বিমুখী এবং ত্রিমুখী বা বহুমুখী হতে পারে। একমুখী সারণিকে আবার সহজ সারণিও বলা হয়ে থাকে। একমুখী সারণিতে মাত্র

একটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্বিমুখী সারণিতে দুটি এবং ত্রিমুখী সারণিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্নে একমুখী, দ্বিমুখী ও ত্রিমুখী সারণির উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. একমুখী সারণি

সারণি ১৩.২ : ১৯৮৫-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

বছর	প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন টাকা)
১৯৮৫	২০৬.৬০
১৯৮৬	৮০.৮০
১৯৮৭	১৯.০০
১৯৮৮	১৪.৮০
১৯৮৯	১৯৩.৮০
১৯৯০	১৮৩.৪০
১৯৯১	১৭৩.০০
১৯৯২	--
১৯৯৩	৩৫০০.০০
১৯৯৪	৩৫০০.০০
মোট	৭৮৭১.৪০

উৎস : গ্রামীণ ব্যাংক।

২. দ্বিমুখী সারণি

সারণি ১৩.৩ : শিক্ষা এবং পেশার ভিত্তিতে একটি এলাকার ২৪৭ জন লোকের গণসংখ্যা নিবেশন

পেশা / শিক্ষা	চাকুরিজীবী	ব্যবসায়ী	বিশেষ বৃত্তিধারী	মজুর	মোট
অশিক্ষিত	--	০৭	--	৭০	৭৭
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	১০	১৮	০২	০৭	৩৭
৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	২১	১২	০৫	০৩	৪১
মেট্রিক পাশ কিন্তু গ্রাজুয়েট নয়	৩২	০৩	০৬	--	৪১
গ্রাজুয়েট এবং তার উর্ধ্বে	৪০	০২	০৯	--	৫১
মোট	১০৩	৪২	২২	৮০	২৪৭

উৎস : কাল্পনিক।

৩. ত্রিমুখী সারণি

সারণি ১৩.৪ : ১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালে একটি এলাকার ১৬ বছর বয়সের উর্ধ্বের অধিবাসীদের লিঙ্গ ও সুখের ভিত্তিতে গণসংখ্যা নিবেশন।

	১৯৮০			১৯৯০		
লিঙ্গ	সুখী	অসুখী	মোট	সুখী	অসুখী	মোট
পুরুষ	৩০	২৪	৫৪	৪৬	৪৪	৯০
স্ত্রী	২৮	৩১	৫৯	৪৪	৪২	৮৬
মোট	৫৮	৫৫	১১৩	৯০	৮৬	১৭৬

উৎস : কাল্পনিক।

রেখাচিত্র (Graphs and Diagrams)

কেবল সারণির মাধ্যমেই নয়, গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন রেখাচিত্রের সাহায্যেও উপস্থাপন করা যায়। রেখাচিত্র সারণি অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে তথ্যগুলোকে প্রকাশ করে। গবেষণার ফলাফলের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য অনেক সময় সারণি জটিল বলে মনে হয় এবং তা পর্যবেক্ষকের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাই তথ্য উপস্থাপন প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে শুধু তথ্যের ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে না, বরঞ্চ তথ্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশের পাশাপাশি তার গতিপ্রকৃতি বা হ্রাসবৃদ্ধি প্রবণতাও প্রকাশ করবে। রেখাচিত্র পদ্ধতি এই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

রেখাচিত্রের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ ও সারণিবদ্ধ তথ্যের উপস্থাপনের ফলে তথ্যের বিশ্লেষণ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া ব্যবহারের ফলে শ্রেণীবদ্ধ তথ্যের কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন সংঘটিত হয় না বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্প্রসারিত হয়। সারণিতে উপস্থাপিত সংখ্যাসূচক তথ্যগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তির সৃষ্টি করে। তাছাড়া সবাই যে সূক্ষ্ম গাণিতিক বিষয়ে আগ্রহী হবেন এমন নয়। এসব কারণে রেখাচিত্রের সাহায্যে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন আজকাল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টসমূহ রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে দেখা যায়।

সারণির তুলনায় রেখাচিত্রের সুবিধাসমূহ

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় রেখাচিত্র কেবল সারণিরই ভিন্নভাবে উপস্থাপিত রূপ। তথ্যের দিক দিয়ে এ দু'য়ের মাঝে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। সারণিতে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। তবুও তথ্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সারণির তুলনায় রেখাচিত্রের যে সব ব্যবহারিক সুবিধা রয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্যগুলো তাদের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও পার্থক্য অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। তাই সারণির চেয়ে রেখাচিত্র অনেক বেশি সহজ, আবেদনক্ষম এবং আকর্ষণীয়।

২. রেখাচিত্রের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই এর তথ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। তাই চাক্ষুষ বিশ্লেষণের বেলায় রেখাচিত্রের ভূমিকা অপরিসীম।

৩. সারণিতে উপস্থাপিত সংখ্যাসূচক তথ্যগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। রেখাচিত্র এই জটিলতা দূর করতে সক্ষম হয়।

৪. রেখাচিত্র বুঝতে হলে খুব বেশি গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে সারণি কষ্টকর এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি। সারণি বিশ্লেষকের জন্য সূক্ষ্ম গাণিতিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ পাঠকের কাছে গবেষণার ফলাফল পৌঁছে দেয়ার জন্য রেখাচিত্র একটি অতি উত্তম পদ্ধতি।

৫. রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত দুটি চলকের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনা করা অত্যন্ত সহজ হয়। যখন দুটি চলক রেখাচিত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে, তখন অতি সহজেই তাদের মধ্যকার পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয়। অপরপক্ষে সারণিতে দুটি উপাত্ত উপস্থাপিত হলে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট নাও হতে পারে।

৬. বেশ কিছু পরিসংখ্যানিক প্রণালির মাধ্যমে বিশ্লেষিত ফলাফল রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিশ্লেষণের ফলাফলকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলা হয়। অন্তঃপ্রক্ষেপ (Interpolation), বহিঃপ্রক্ষেপ (Extrapolation), মধ্যমা, মোড, নির্ভরণ প্রভৃতি প্রণালির সাহায্যে বিশ্লেষিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য রেখাচিত্র খুবই উপযোগী।

রেখাচিত্র অঙ্কন

রেখাচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের দরকার হয়। রেখাচিত্র তৈরিকরণ একটি কলাবিশেষ। তাই এর জন্য অঙ্কনকারীর সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান যুগে সামাজিক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সারণির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রেখাচিত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যবহার সামাজিক গবেষণায় রেখাচিত্রের ব্যবহারকে আর একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। কম্পিউটারের সাহায্যে আজকাল অতি স্বল্প সময়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সব ধরনের রেখাচিত্র অঙ্কন করা হচ্ছে। কম্পিউটারের সাহায্যে রেখাচিত্রে রঙের ব্যবহার এর উৎকর্ষ ও আকর্ষণ অনেক গুণে বাড়িয়ে তুলেছে। SPSS for Windows-এই Soft are-টি ব্যবহার করে সব থেকে চমৎকারভাবে সব ধরনের রেখাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। কা ব্যবহারে যাঁরা তুলনামূলকভাবে কম অভিজ্ঞ তাঁরা MS-Word-এ ঢুকে 'Chart' প্রোগ্রামের সাহায্যেও বহুধরনের রেখাচিত্র অঙ্কন করতে পারেন।

সাধারণত নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হয় :

১. কালীন লেখ (Historigram)

২. ব্যাপ্তি রেখা (Range Curve)

৩. স্তর রেখা (Band Curve)

৪. আয়তলেখ (Histogram)
৫. গণসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)
৬. দণ্ডচিত্র (Bar-Diagram)
৭. যুগল দণ্ডচিত্র (Paired Bars)
৮. বৃত্ত চিত্র (Pie-Chart)
৯. রূপচিত্র (Pictogram)
১০. মানচিত্র (Map)

১. কালীন লেখ (Historigram)

সময়ের ব্যবধানে হ্রাস-বৃদ্ধিকৃত তথ্যকে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। উপাত্তের সংখ্যা একাধিক হলে তা থেকে একাধিক রেখা লাভ করা যায়। এভাবে বিভিন্ন বছরে উৎপাদিত ফসল, শিল্পজাত দ্রব্য, আয়-ব্যয়, আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, জনসংখ্যা ইত্যাদি রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তাকে কালীন লেখ বলে। কোনো উপাত্ত একটি বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করলে একটি রেখার সাহায্যে তা রেখাচিত্রে উপস্থাপিত হয়। আবার যদি কোনো উপাত্ত একাধিক বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করে তবে সেগুলো একাধিক রেখার মাধ্যমে রেখাচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। তাই একটি কালীন লেখে এক বা একাধিক রেখা থাকতে পারে। ১৩.১ নং চিত্রে একটি রেখা সম্বলিত এবং ১৩.২ নং চিত্রে দুটি রেখা সম্বলিত কালীন লেখের উদাহরণ দেওয়া হলো।

সারণি ১৩.৪ : ১৯৮৫-৯৫ সালে কুষ্টিয়া জেলায় পাটের উৎপাদন

বছর	পাটের উৎপাদন (টনে)
১৯৮৫	৮৭০
১৯৮৬	৯১০
১৯৮৭	৯৬৫
১৯৮৮	৯৫০
১৯৮৯	৯২০
১৯৯০	১০১০
১৯৯১	১০৫০
১৯৯২	১০১০
১৯৯৩	৯৬৫
১৯৯৪	৯১০
১৯৯৫	৯২৫
মোট	১০৪৮৫

উৎস : কাল্পনিক

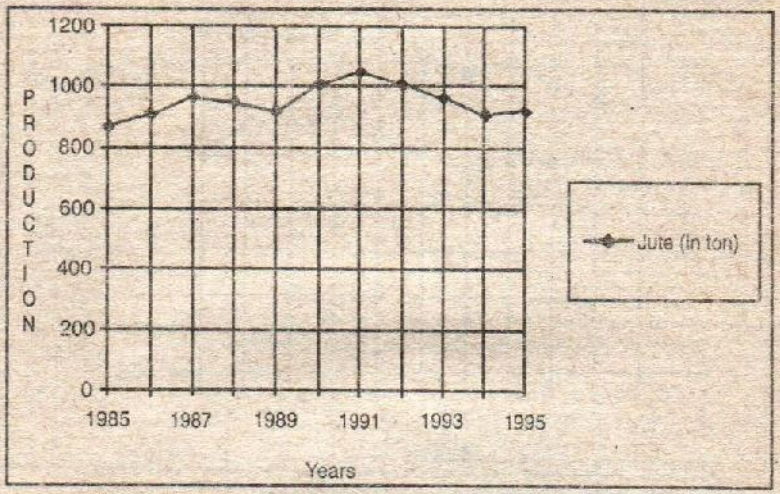

চিত্র ১৩.১ : কুষ্টিয়া জেলায় পাট উৎপাদন নির্দেশক কালীন লেখ। *(সূত্র : সারণি ১৩.৪)*

সারণি ১৩.৫ : ১৯৮৬–৯৬ সালে যশোর জেলায় ধান ও পাটের উৎপাদন।

বছর	ধানের উৎপাদন (টনে)	পাটের উৎপাদন (টনে)
১৯৮৬	৮৮০	১২২০
১৯৮৭	৮৯৫	১২৫৫
১৯৮৮	৯৪০	১৩১০
১৯৮৯	৯৮৫	১৪০০
১৯৯০	৯৩০	১৩৫০
১৯৯১	১০১০	১৪১৫
১৯৯২	১০৮০	১৪৮০
১৯৯৩	১১৬৫	১৫৩৫
১৯৯৪	১১৩০	১৫০০
১৯৯৫	১১৪৫	১৫১০
১৯৯৬	১০০৩	১৫২৫
মোট	১১১৬৩	১৫৫০০

উৎস : কাল্পনিক।

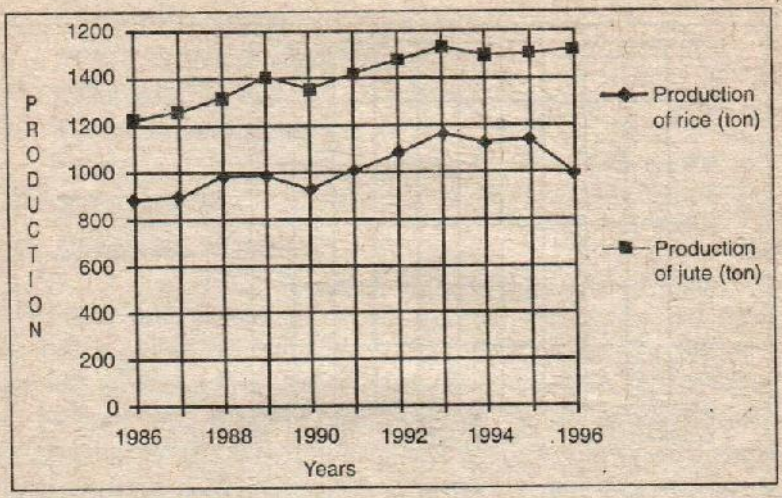

চিত্র ১৩.২ : যশোর জেলায় ধান ও পাট উৎপাদন নির্দেশক কালীন লেখ। *(সূত্র : সারণি ১৩.৫)*

২. ব্যাপ্তি রেখা (Range Curve)

সময়ের ব্যবধানের ফলে কোনো চলকের মানের পার্থক্যের বিস্তার দেখানোর জন্য ব্যাপ্তি রেখা ব্যবহৃত হয়। এই রেখাচিত্রে চলকের সর্বোচ্চ মানসমূহের জন্য একটি এবং সর্বনিম্ন মানগুলোর জন্য অন্য একটি রেখা অঙ্কন করা হয়। দুটি রেখার মধ্যবর্তী স্থানকে (বিস্তার) রং বা রেখার মাধ্যমে আচ্ছাদন করে দেওয়া হয়। এভাবে একই চলকের বিভিন্ন সময়কালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মধ্যকার পার্থক্য সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শিত হয়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো।

সারণি ১৩.৬ : কোনো এক বছরে ধানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য।

মাস	সর্বোচ্চ মূল্য (প্রতি মন টাকায়)	সর্বনিম্ন মূল্য (প্রতি মন টাকায়)
জানুয়ারি	২১০	১৯০
ফেব্রুয়ারি	২২৫	২০৫
মার্চ	২৩৫	২২০
এপ্রিল	২৪৫	২৩০
মে	২৫৫	২৩৫
জুন	২৬০	২৪০

মাস	সর্বোচ্চ মূল্য (প্রতি মন টাকায়)	সর্বনিম্ন মূল্য (প্রতি মন টাকায়)
জুলাই	২৬৫	২৫০
আগস্ট	২৫৫	২৪০
সেপ্টেম্বর	২৪৫	২৩০
অক্টোবর	২৪০	২৩০
নভেম্বর	২২৫	২১৫
ডিসেম্বর	২১৫	২০০

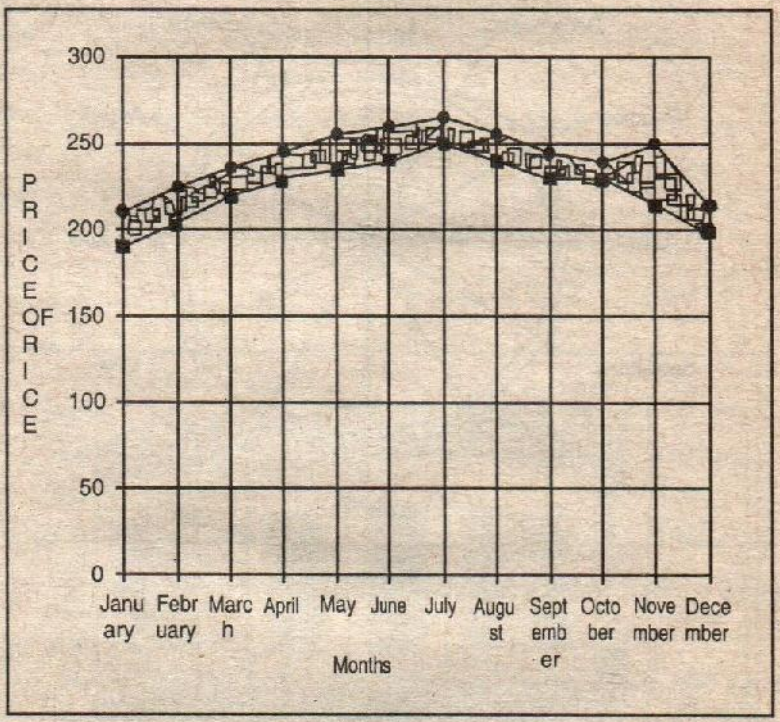

চিত্র ১৩.৩ : ধানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্দেশক ব্যাপ্তি রেখা *(সূত্র : সারণি ১৩.৬)*

চিত্র ১৩.৩-এ উপস্থাপিত ব্যাপ্তি রেখা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাপ্তি রেখার মাধ্যমে ১৩.৬ নং সারণির অনুরূপ তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা যায়। অপর পৃষ্ঠায় আর এক ধরনের ব্যাপ্তি রেখার সাহায্যে ১৩.৬ নং সারণির তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো। অপর পৃষ্ঠার এ বিশেষ ধরনের ব্যাপ্তি রেখাচিত্রটি আকৃতিতে অনেকটা মাকড়সার জালের মতো। এহেন আকৃতির

ব্যাপ্তি রেখার মাধ্যমে অতি সহজেই উচ্চ মানসম্পন্ন ও নিম্ন মানসম্পন্ন তথ্য সারিগুলোর দ্বারা সৃষ্ট উচ্চ মানসম্পন্ন ও নিম্ন মানসম্পন্ন রেখাদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণীত হয় এবং তাদের মধ্যকার ব্যবধানের পরিমাণ অতি সহজেই অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কেন্দ্র হতে অপেক্ষাকৃত নিকটের বক্র রেখাটি নিম্ন মানসম্পন্ন তথ্যসমূহ এবং দূরবর্তী বক্র রেখাটি উচ্চ মানসম্পন্ন তথ্যসমূহ উপস্থাপন করে। এদের মধ্যকার ব্যবধান তথ্য সারিদ্বয়ের মধ্যকার বিচ্যুতি নির্দেশ করে।

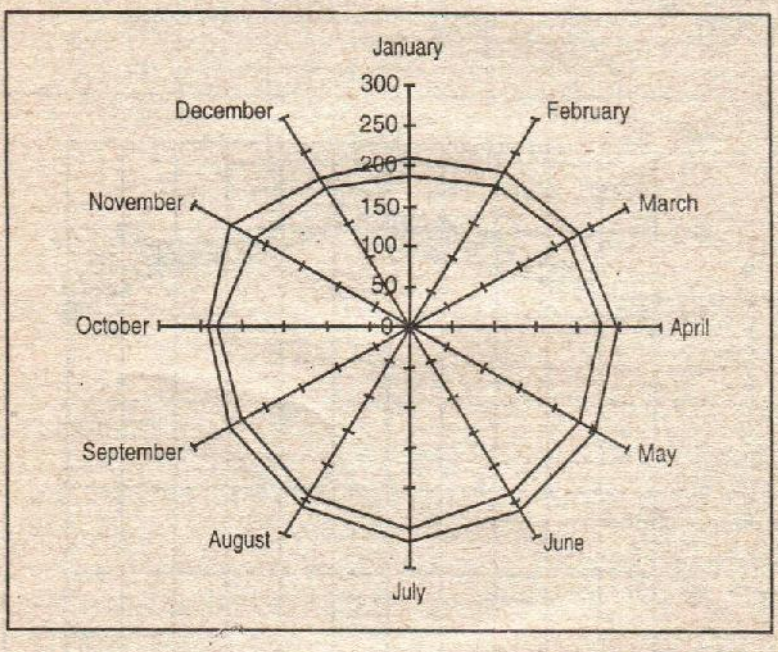

চিত্র ১৩.৪ : ধানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্দেশক ব্যাপ্তি রেখা *(সূত্র : সারণি ১৩.৬)*

৩. স্তর রেখা (Band Curve)

চলকের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অংশ একসাথে পরপর সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করতে স্তর রেখা ব্যবহার করা হয়। চলকের বিভিন্ন অংশ পরপর অঙ্কন করা হয় এবং এ কারণে অনেকগুলো স্তর পাওয়া যায়। এক একটি স্তরে আলাদা আলাদা রং বা বিভিন্ন ধরনের রেখা অঙ্কন করে ভরাট করে দিতে হয়। এভাবে স্তরগুলো আনুভূমিক রেখা হতে সর্বোচ্চ স্তরে রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। স্তর রেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সময়ভেদে চলকসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলোর পার্থক্য অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ১৩.৫ নং রেখাচিত্রটি স্তর রেখার একটি উদাহরণ।

সারণি ১৩.৭ : ১৯৮৫-৯৫ সালে একটি এলাকায় বিভিন্ন প্রকার ধানের উৎপাদন।

বছর	ধানের উৎপাদন (টনে)				
	আমন	আউশ	বোরো	অন্যান্য	মোট
১৯৮৫	৭২০	৭১০	২১০	১৩০	১৭৭০
১৯৮৬	৭৩০	৭৩০	২২৫	১২৫	১৮১০
১৯৮৭	৭৩৫	৭২৫	২৩৫	১৩৫	১৮৩০
১৯৮৮	৭১০	৭৩৫	২৪০	১৪০	১৮২৫
১৯৮৯	৭১৫	৭৫০	২৬০	১৫০	১৮৭৫
১৯৯০	৭৪০	৭৩৫	২৫০	১৬৫	১৮৯০
১৯৯১	৭৫৫	৭৪৫	২৬৫	১৬০	১৯২৫
১৯৯২	৭৬৫	৭৫০	২৬০	১৭৫	১৯৫০
১৯৯৩	৭৬০	৭২৫	২৭০	১৯০	১৯৪৫
১৯৯৪	৭৪০	৭২০	২৫০	১৭০	১৮৮০
১৯৯৫	৭৩৫	৭৩০	২৩৫	১৫৫	১৮৫৫
মোট	৮১০৫	৮০৫৫	২৭০০	১৬৯৫	২০৫৫৫

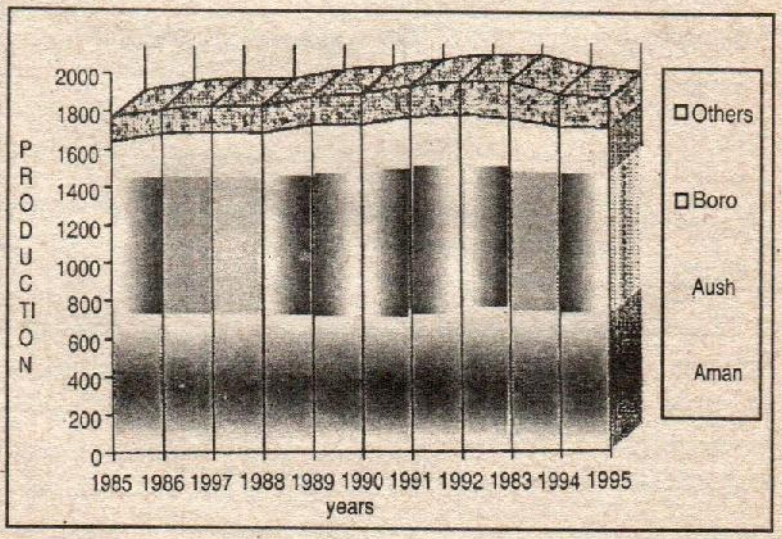

চিত্র ১৩.৫ : বিভিন্ন প্রকার ধানের উৎপাদন নির্দেশক স্তর রেখা। *(সূত্র : সারণি ১৩.৭)*

৪. আয়তলেখ (Histogram)

আয়তলেখের মাধ্যমে গণসংখ্যা নিবেশনের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত গণসংখ্যাকে ঊর্ধ্বমুখী আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে X অক্ষ শ্রেণীবিস্তার এবং Y অক্ষ শ্রেণীর গণসংখ্যার প্রতীকস্বরূপ কাজ করে। গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণী অনুযায়ী X অক্ষকে ভাগ করা হয়। শ্রেণীব্যাপ্তি যদি সমান আকারের হয় তাহলে আয়তক্ষেত্রগুলোর প্রস্থও সমান আকারের হবে। এ ক্ষেত্রে প্রস্থ শ্রেণীব্যাপ্তির প্রতীক হিসেবে এবং উচ্চতা শ্রেণী গণসংখ্যার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। রেখাচিত্রের মাধ্যমে চলকের হ্রাস-বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে আয়তক্ষেত্রগুলোকে একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে পরপর সজ্জিত আয়তক্ষেত্রগুলোকে একত্রে আয়তলেখ বলা হয়। নিচে আয়তলেখের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ১৩.৮ : বয়সের ভিত্তিতে ৮৯৪ জন লোকের গণসংখ্যা নিবেশন।

বয়স শ্রেণী (বছর)	লোকসংখ্যা
১৫–২০	৭০
২০–২৫	৮৫
২৫–৩০	১০৭
৩০–৩৫	১১০
৩৫–৪০	১১৮
৪০–৪৫	১২৯
৪৫–৫০	১১০
৫০–৫৫	৯০
৫৫–৬০	৭৫
মোট	৮৯৪

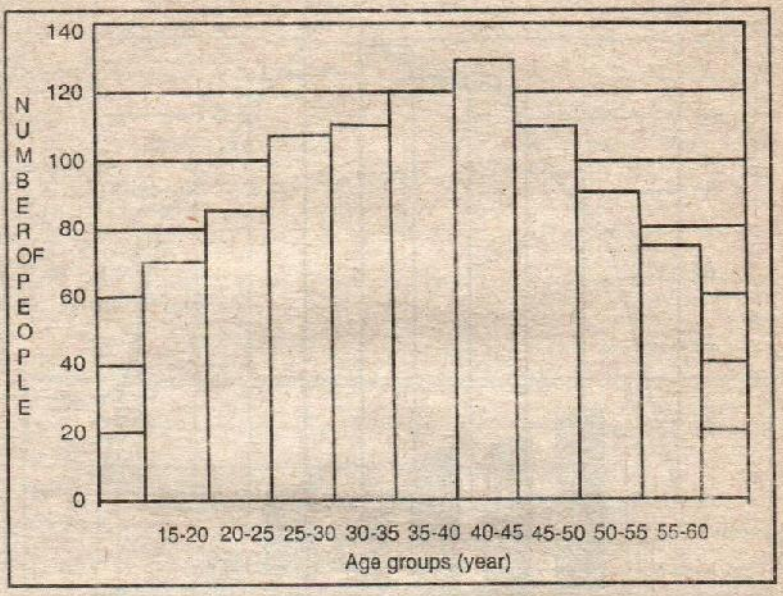

চিত্র ১৩.৬ : বয়সের ভিত্তিতে গণসংখ্যা নিবেশন নির্দেশক আয়তলেখা। *(সূত্র : সারণি ১৩.৮)*

৫. গণসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)

গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রেণীব্যাপ্তিসমূহের মধ্যমানগুলোকে X অক্ষে এবং গণসংখ্যাকে Y অক্ষে প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর গণসংখ্যাকে সেই শ্রেণীব্যাপ্তির মধ্যমানের বরাবর স্থাপন করা হয়। অতঃপর উক্ত স্থাপিত বিন্দুগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সরলরেখার সাহায্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। বহুভুজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রথম ও শেষের শ্রেণী দুটোকে লেখের অন্তর্ভুক্ত করে X অক্ষে তাদের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করত বিন্দু দুটোকে টেনে লেখের মূল রেখার সাথে সংযুক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় রেখাচিত্রটি বহুভুজের আকার ধারণ করে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে গণসংখ্যা বহুভুজ। গণসংখ্যা বহুভুজের একটি উদাহরণ ১৩.৭ নং চিত্রে প্রদর্শন করা হলো।

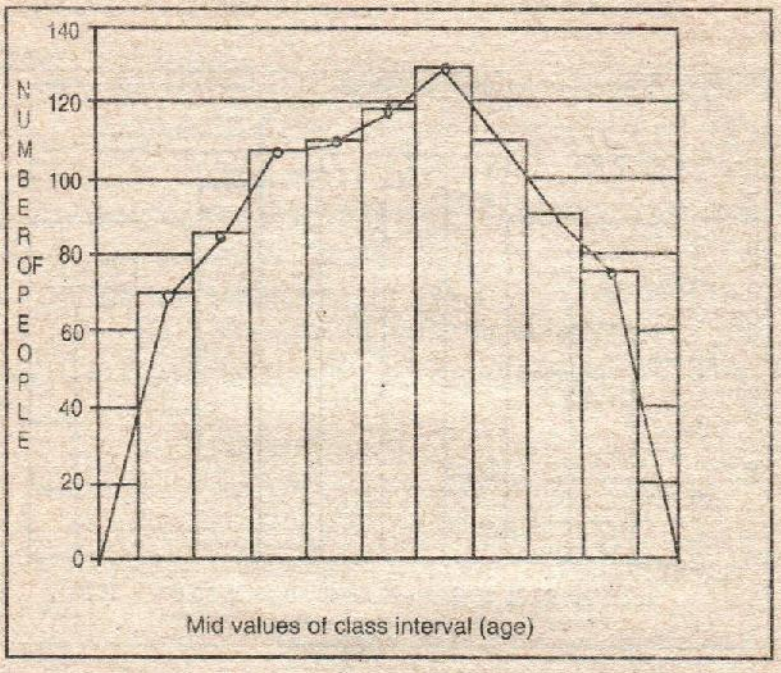

চিত্র ১৩.৭ : বয়সের ভিত্তিতে গণসংখ্যা নিবেশন নির্দেশক গণসংখ্যা বহুভুজ। *(সূত্র : সারণি ১৩.৮)*

৬. দণ্ডচিত্র (Bar-Diagram)

সংগৃহীত তথ্য যদি রেখাচিত্রের দণ্ডাকারে উপস্থাপন করা হয়, তবে তাকে দণ্ডচিত্র বলে। উপস্থাপিত দণ্ডগুলো চলকের মান নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে Y অক্ষে চলকের মান বা গণসংখ্যা এবং X অক্ষে সময়, স্থান, গুণ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি দণ্ডের প্রস্থ সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং দণ্ডগুলো পরস্পর আলাদা করার জন্য তাদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক দেওয়া দরকার। রেখাচিত্রের সমান্তরাল বা আনুভূমিক অক্ষে চলকের মান অথবা শ্রেণীর গণসংখ্যা প্রদর্শন করেও দণ্ডচিত্র অঙ্কন করা যায়। অপর পৃষ্ঠায় ১৩.৮ নং চিত্রে একটি দণ্ডচিত্রের উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ১৩.৯ : ১৯৯০-৯৬ সালে রাজশাহী জেলায় আমের উৎপাদন।

বছর	আমের উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৯০	১০৫
১৯৯১	১২০
বছর	আমের উৎপাদন (হাজার টন)

বছর	আমের উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৯২	১৫০
১৯৯৩	১৪০
১৯৯৪	১৭০
১৯৯৫	১৭৫
১৯৯৬	১৯০
মোট	১০৫০

উৎস : কাল্পনিক।

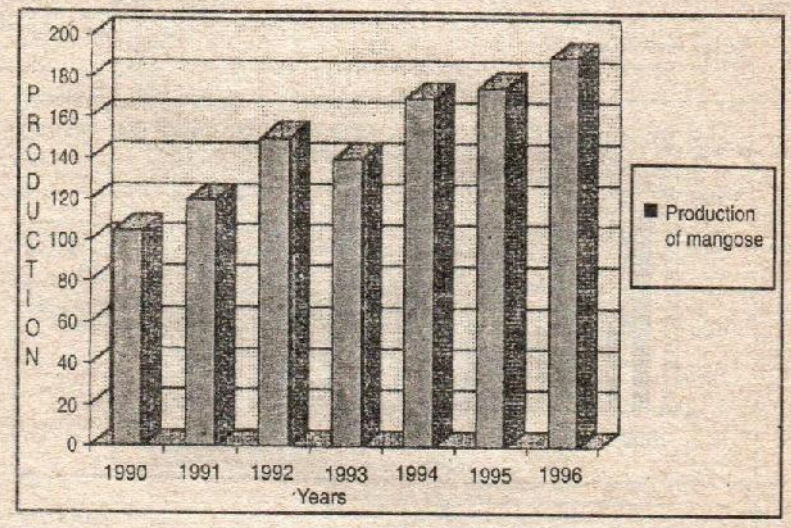

চিত্র ১৩.৮ : আমের উৎপাদন নির্দেশক দণ্ডচিত্র। *(সূত্র : সারণি ১৩.৯)*

যৌগিক দণ্ডচিত্র (Multiple Bar-Diagram)

একাধিক সহজ দণ্ড কোনো প্রকার ফাঁক না রেখে পাশাপাশি অঙ্কন করলে এবং তা যদি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চলক উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে যৌগিক দণ্ডচিত্র বলে। পাশাপাশি অবস্থানরত বিভিন্ন দণ্ডকে ভিন্ন ভিন্ন রং অথবা রেখা দ্বারা পৃথক করা হয়। এভাবে যৌগিক দণ্ডচিত্র একই সময়ে বিভিন্ন চলকের মান প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। ১৩.৯ চিত্রে যৌগিক দণ্ডচিত্রের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

সারণি ১৩.১০ : ১৯৯০–৯৬ সালে খুলনা জেলায় পাট, ধান ও গমের উৎপাদন (হাজার টন)।

বছর	উৎপাদন		
	পাট	ধান	গম
১৯৯০	২২০	১৯০	৯০
১৯৯১	২৪৫	১৮৫	১০০
১৯৯২	২৫০	২২০	১১৫
১৯৯৩	২৭০	২৩০	১২০
১৯৯৪	২৬০	২২৫	১২৫
১৯৯৫	২৪৫	২০০	১০০
১৯৯৬	২৩৫	২১০	১০৫
মোট	১৭২৫	১৪৭০	৭৪৫

উৎস : কাল্পনিক।

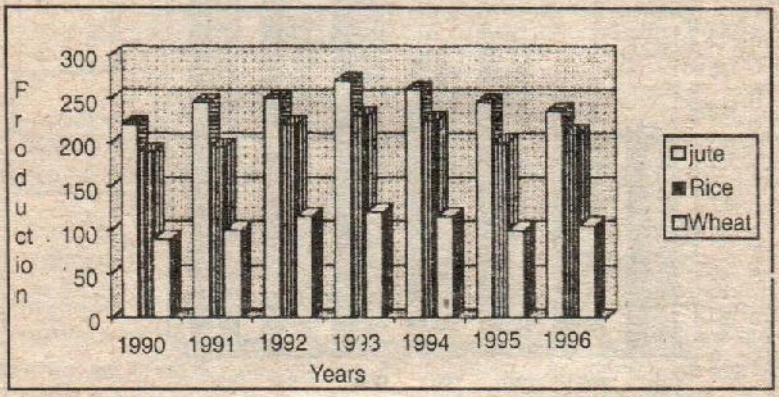

চিত্র ১৩.৯ : পাট, ধান ও গমের উৎপাদন নির্দেশক যৌগিক দণ্ডচিত্র। *(সূত্র : সারণি ১৩.১০)*

৭. যুগল দণ্ডচিত্র (Paired Bars)

যদি দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চলককে একই পরিমাপের এককের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর না হয়, তবে পাশাপাশি দু'ধরনের একক ব্যবহার উপযোগী করে যুগল দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে তাদেরকে রেখাচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের চলককে সাধারণ দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। যদি উক্ত চলকদ্বয়কে পরস্পর তুলনা করার দরকার হয়, তবে তার জন্য যুগল দণ্ডচিত্র অতি উত্তম তথ্য উপস্থাপন প্রক্রিয়া। যদিও একই রেখাচিত্রের সাহায্যে তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়, তথাপি তারা ভিন্ন ভিন্ন একক দ্বারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ১৩.১০ চিত্রটি যুগল দণ্ডচিত্রের একটি উদাহরণ।

সারণি ১৩.১১ : ১৯৯৫ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে আলু চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ও আলুর উৎপাদন।

দেশ	জমির পরিমাণ (হাজার একর)	আলুর উৎপাদন (হাজার টন)
রাশিয়া	৫০০	৭০০
ইংল্যান্ড	৩০০	৫০০
ইটালি	২৫০	৪৫০
ফ্রান্স	৩০০	৩৫০
জার্মানি	৩৫০	৪০০
ফিনল্যান্ড	৪০০	৫০০

উৎস : কাল্পনিক।

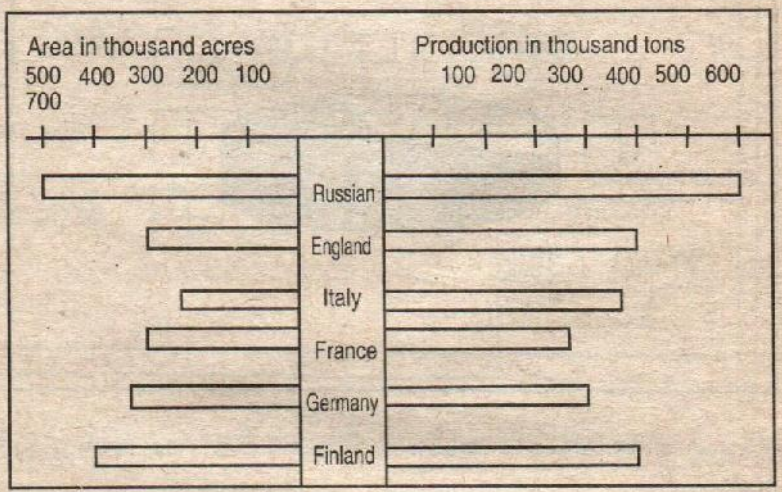

চিত্র ১৩.১০ : আলু চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ও আলুর উৎপাদন নির্দেশক যুগল দণ্ডচিত্র। *(সূত্র : সারণি ১৩.১১)*

৮. বৃত্তচিত্র (Pie-Chart)

বৃত্ত চিত্র প্রকৃতপক্ষে একটি বৃত্ত যাকে বিভিন্নভাগে আনুপাতিক হারে বিভক্ত করে তথ্যের বিভিন্ন উপাদান প্রদর্শন করা হয়। উপাদানগুলো পাশাপাশি ছোট–বড় আকারে অবস্থান করার কারণে তাদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক তুলনা খুব সহজ হয়। বৃত্তে উপস্থাপিত কোন উপাদানের পরিমাণ কতটুকু এর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্রই তা আয়ত্তে এসে যায়। অপর পৃষ্ঠায় বৃত্ত চিত্রের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

BANGLADESH Library

সারণি ১৩.১২ : কোনো এলাকার ২০১৩ জন লোকের পেশার ভিত্তিতে গণসংখ্যা নিবেশন।

পেশা	লোকের সংখ্যা
ব্যবসায়	৭২০
চাকুরি	৪০৮
বিশেষ পেশা	২০৫
শ্রমিক	৫৩০
অন্যান্য	১৫০
মোট	২০১৩

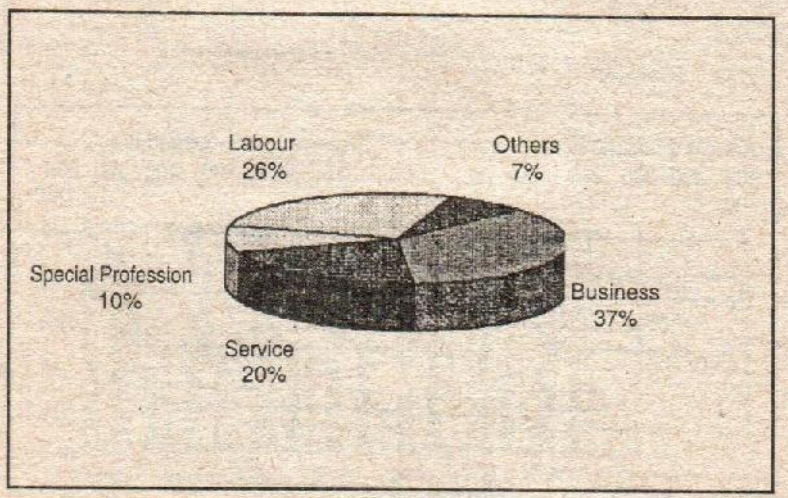

চিত্র ১৩.১১ : পেশার ভিত্তিতে গণসংখ্যা নিবেশন নির্দেশক বৃত্তচিত্র। *(সূত্র : সারণি ১৩.১২)*

৯. রূপচিত্র (Pictogram)

রূপচিত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিভিন্ন ছবির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। ব্যবহৃত ছবিগুলো উপস্থাপিত তথ্যের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করে। তাই রূপচিত্র বোঝার জন্য সংখ্যাভিত্তিক জ্ঞানের সব থেকে কম দরকার হয়। ব্যবহৃত ছবিগুলোকে পরিমাপ করা হয় না ; বরং গণনা করা হয়। একই পরিমাণের বস্তু বা বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য একই পরিমাণের ছবি ব্যবহার করা সমীচীন। এর অন্যথা হলে রূপচিত্রের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়। রূপচিত্রের ছবিগুলো খুব সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং মনের উপর স্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্য তথ্য উপস্থাপনের জন্য এটি একটি অতি উত্তম পদ্ধতি। ১৩.১২ নং চিত্রটি রূপচিত্রের একটি উদাহরণ।

সারণি ১৩.১৩ : কোনো শহরে তিন বছরে সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা।

বছর	সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা
১৯৯৪	৫০০
১৯৯৫	৬০০
১৯৯৬	৪০০

উৎস : কাল্পনিক।

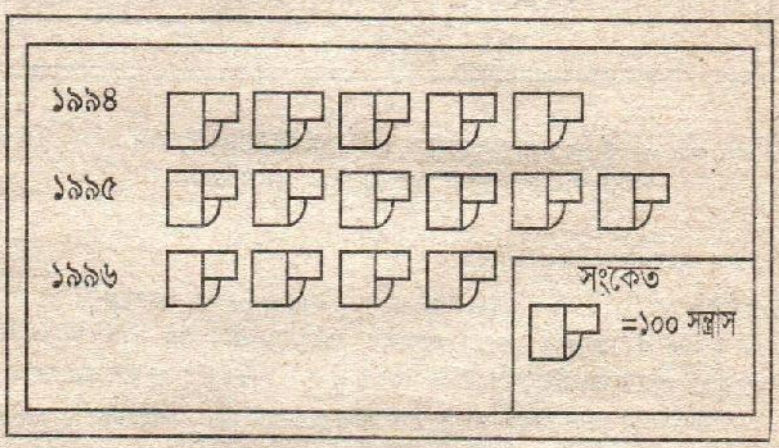

চিত্র ১৩.১২ : তিন বছরে সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা প্রদর্শনে রূপচিত্র। *(সূত্র : সারণি ১৩.১৩)*

১০. মানচিত্র (Map)

গবেষণালব্ধ উপাত্ত মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে সমস্যাসমূহের অবস্থান নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে মানচিত্র খুবই উপযোগী। আঞ্চলিক ভিত্তিতে তথ্যসমূহকে তুলনা করার জন্য মানচিত্রের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। তথ্যসমূহ মানচিত্রে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের রং বা নানা আকার বিশিষ্ট রেখা ব্যবহার করা যায়। এতে তথ্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপর পৃষ্ঠায় মানচিত্রে তথ্য উপস্থাপনের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

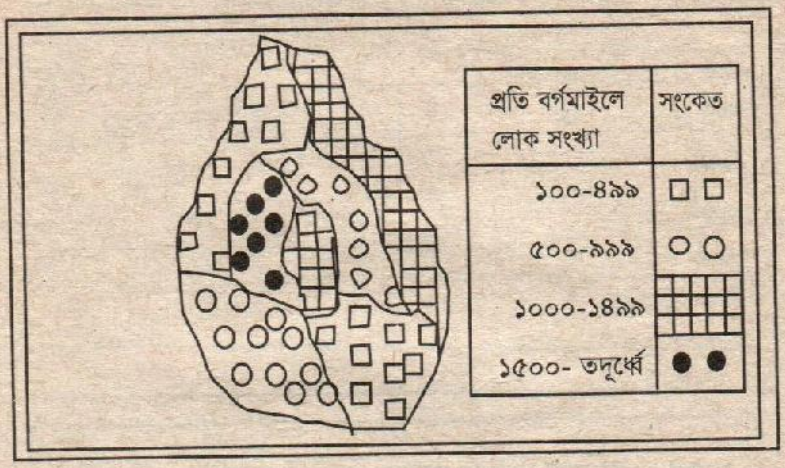

চিত্র ১৩.১৩ : মানচিত্রের মাধ্যমে শ্রীলংকার মোট ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে বসবাসকারী লোকসংখ্যা প্রদর্শন। *(সূত্র : কাল্পনিক)*

রেখাচিত্র অঙ্কনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আগেই বলা হয়েছে যে, রেখাচিত্রের সাহায্যে তথ্য উপস্থাপন একটি কলাস্বরূপ। এর জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের একান্তই প্রয়োজন। তবে রেখাচিত্র অঙ্কনকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি নজর রাখলে রেখাচিত্রে পদ্ধতিগত ভুল-ত্রুটির পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

১. প্রত্যেকটি রেখাচিত্রের একটি নাম প্রদান করতে হবে। এই নাম রেখাচিত্রে উপস্থাপিত তথ্যের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। রেখাচিত্রের নাম হলো এর সমগ্র বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত আকার যার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশ পায়। এই নামকরণ এমন হওয়া উচিত যাতে এর দ্বারা রেখাচিত্রে কি ধরনের উপাত্ত এবং কীভাবে তা উপস্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হয়। রেখাচিত্রের নাম সাধারণত এর নিচে ঠিক মাঝখানে লেখা হয়।

২. প্রত্যেকটি চিত্রের একটি ক্রমিক নম্বর থাকা দরকার যাতে গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত একাধিক রেখাচিত্রের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। রেখাচিত্রের ক্রমিক নম্বর সাধারণত রেখাচিত্রের নিচে এর নামের বামদিকে অবস্থান করে। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

৩. কোন রেখা বা কোন দণ্ড কিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তা সংকেতের মাধ্যমে উল্লেখ করতে হয়। এতে রেখাচিত্রের স্পষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়।

৪. যে তথ্যের ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয় তার উৎসের বিবরণ এতে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত লেখচিত্রের নিচে উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। উৎসের উল্লেখ থাকলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অতি সহজেই সেই উৎস অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। একই উৎস বার বার ব্যবহার করার দরকার হলে তার পূর্ণ বিবরণ বার বার না দিয়ে দ্বিতীয় বার থেকে 'প্রাগুক্ত' কথাটি লেখার রীতি প্রচলিত আছে। রেখাচিত্রের তথ্য কোনো প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রতিবেদন বা পত্র-পত্রিকা যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, তার বিবরণ অবশ্যই এতে থাকতে হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গবেষণা প্রতিবেদন লিখন
WRITING A RESEARCH REPORT

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাঁদের জীবনের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। উদ্দেশ্যানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন বিভিন্ন লক্ষ্যে প্রণীত হয় বিধায় উপস্থাপনা ও কাঠামোর দিক দিয়ে সেগুলোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। একজন সাংবাদিক সংঘটিত কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে তা প্রতিবেদন আকারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। কোনো পুলিশ অফিসার কোনো ঘটনার তদন্ত করে তার রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। বিভিন্ন ব্যাংক প্রতি অর্থবছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি এক রকম নয় এবং তা সব সময় সবার জন্যও লেখা হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের পাঠক নির্ধারিত থাকে। তাই প্রতিবেদন লেখার সময় সেই বিশেষ পাঠকের উপযোগী করে তা তৈরি করা হয়। তবে একথা সত্য যে, সব প্রতিবেদনেরই উদ্দেশ্য হলো তথ্য প্রকাশ করা। সংগৃহীত তথ্য এবং লেখকের স্বীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এই প্রতিবেদন একটি বিশেষ সৃষ্টিতে পরিণত হয়। তাই নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাপক অনুসন্ধান পরিচালনার পর সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরির কাজে মনোযোগ দেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদন তৈরির কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত ও আনন্দদায়ক। দীর্ঘদিন যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় শেষে তিনি যা লাভ করেন তা তিনি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে চান প্রতিবেদনরূপে। কোনো গবেষণার ফলাফল যত মূল্যবানই হোক না কেন, তা সংশ্লিষ্ট পাঠকের সামনে যথার্থরূপে তুলে ধরতে না পারলে কেউই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং নতুন জ্ঞান হিসেবে তা স্বীকৃতি লাভ করে না বা জ্ঞানের প্রসার সম্ভব হয় না। প্রতিবেদন হচ্ছে গবেষণার সর্বশেষ ধাপ যার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত আগ্রহী পাঠকবৃন্দের কাছে এসে পৌঁছে। প্রতিবেদনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। নতুন সৃষ্টির আনন্দ জড়িত থাকলেও প্রতিবেদন তৈরির কাজটি কিন্তু একেবারেই সহজসাধ্য নয়। সংশ্লিষ্ট পাঠকবৃন্দের উপযোগী করে একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখতে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের দরকার হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই বিষয়ে পরিচালিত অনুসন্ধানের উপর তৈরি প্রতিবেদন গবেষকভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনোটি পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় ; আবার কোনোটি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ

করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদন লিখন একটি কলাবিশেষ। তাই একই ঘটনার উপর পরিচালিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদনে গবেষকভেদে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

গবেষণার প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক নজর দিতে হবে তা হলো প্রতিবেদনটি কাদের উদ্দেশ্যে লিখিত হবে। যদি প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বা গবেষকদের জন্য লেখা হয় তবে তা যে রকম হবে, সর্বসাধারণের জন্য লিখলে তা অবশ্যই ভিন্নরূপ হবে। অর্থাৎ প্রতিবেদনের ধরন তার পাঠক দ্বারা নিশ্চিত হয়। তবে একথা সত্য যে, প্রতিবেদন সাধারণ মানুষের জন্যই লেখা হোক বা বিশেষ জনসমষ্টির জন্যই লেখা হোক, তা লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় দুটির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে :

১. কি তথ্যাবলি পরিবেশন করা প্রয়োজন ?
২. কিভাবে তার সর্বাধিক উত্তম পরিবেশনা নিশ্চিত করা যায় ?

প্রতিবেদনের ধরন

উদ্দেশ্য দ্বারা প্রতিবেদন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের উপরই প্রতিবেদনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। সব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য পাঠকবৃন্দের কাছে কিছু পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করা হলেও গবেষণার প্রতিবেদন আর পুলিশ অফিসারের বা সাংবাদিকের প্রতিবেদন কোনোক্রমেই এক নয়। কারণ তা নিজস্ব উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন। উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ ও প্রকৃতির দিক বিচারে প্রতিবেদনকে নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায় :

১. তথ্যমূলক প্রতিবেদন (এতে ঘটনার বর্ণনা ছাড়া বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা, সুপারিশমালা ইত্যাদি নাও থাকতে পারে)।
২. গবেষণার প্রতিবেদন (এতে তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সুপারিশমালা থাকে যার সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর হয়)।

এ অধ্যায়ে গবেষণা প্রতিবেদনই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সমস্যাসংক্রান্ত তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত ও পদ্ধতিগত রূপ। সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের পর গবেষক তাঁর গবেষণার ফলাফল পাঠকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পন্থায় তা প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে 'প্রতিবেদন লিখন' পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। কারণ প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো বিস্তারিত তথ্য সংক্ষিপ্ত ফলাফল আকারে এমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করা যাতে পাঠকবৃন্দ গবেষকের কোনো প্রকার সাহায্য ছাড়াই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং গবেষণার ফলাফলের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় প্রতিবেদনটির পাঠক কারা হবেন সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ গবেষণা প্রতিবেদন বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় যেখানে পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মননশীলতা, আগ্রহ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতি

যত্নসহকারে বিবেচনায় রাখা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রতিবেদন সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন :

১. বিশদ বা বিস্তৃত প্রতিবেদন (যেমন, থিসিস)।
২. মাঝারি আকারের প্রতিবেদন (যেমন, কোনো জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরি গবেষণামূলক প্রবন্ধ)।
৩. সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (যেমন, গবেষণার সার-সংকলন)।

প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ (Items Included in a Report)

কোনো সামাজিক গবেষণা পরিচালনা শেষে তার একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবেদন লেখার জন্য তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট ও ধরাবাঁধা রীতি প্রচলিত নেই। গবেষণার উদ্দেশ্যভেদে এর লিখন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

১. গবেষণা সমীক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান এবং তাত্ত্বিক গবেষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণ।
২. গবেষণা নকশা ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল বর্ণনা।
৩. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা।
৪. তথ্যের উৎসসমূহ উল্লেখ।
৫. গবেষণার বিষয়-পরিধি (Scope) নিরূপণ।
৬. গবেষণার কার্যকর প্রকল্পন (Hypothesis) সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
৭. গবেষণায় ব্যবহৃত কলাকৌশল ও পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা।
৮. সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন।
৯. প্রকল্পন যাচাইয়ের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা।
১০. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার টানা এবং প্রায়োগিক তাৎপর্য নির্দেশ।
১১. বিশেষ মন্তব্য।
১২. পরিশিষ্ট (নমুনা, প্রশ্নমালা, নমুনা সাক্ষাৎকার প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে)।

সমাজবিজ্ঞানী মার্গারেট স্টাসি (Margaret Stacey, 1979)-এর মতানুসরে গবেষণার প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত :

* কার বা কাদের অর্থানুকূল্যে কে বা কারা গবেষণাটি পরিচালনা করছেন তার বর্ণনা গবেষণায় উল্লেখ থাকতে হবে।
* গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
* গবেষণাটির শুরু ও সমাপ্তিকালের উল্লেখ থাকতে হবে।
* জনগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, নমুনা আকার এবং নমুনায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে।

* গবেষণা পরিচালক, সহকারী ও মাঠকর্মীদের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি প্রতিবেদনে স্থান পাবে।
* তথ্য সংগ্রহের কলাকৌশল ও উপকরণাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকতে হবে।
* গবেষণার ফলাফল কি দাঁড়ালো তার বিবরণ থাকতে হবে।
* প্রকল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ তথ্যাবলির বিবরণ থাকতে হবে।
* গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে।
* গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ থাকতে হবে।

প্রতিবেদন লিখন পদ্ধতি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরাও একমত হতে পারেন নি। এতেই প্রমাণিত হয় প্রতিবেদন লিখন একটি অত্যন্ত জটিল ও বেশ শক্ত কাজ। তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করে প্রতিবেদন তৈরি করলে তা একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ ধারণ করবে বলে আশা করা যায়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে একজন গবেষকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of a Good Report)

হ্যান্স রাজ (Hans Raj, 1979)-এর মতানুসারে একটি ভালো গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক. স্পষ্ট চিন্তা (Clear Thought)

গবেষক দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান প্রতিবেদনে উপস্থাপন করবেন, যাতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের পক্ষে বক্তব্য বুঝতে কোনো প্রকার অসুবিধা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে না হয়। গবেষণার ফলাফলে মৌলিকত্ব থাকতে হবে। মৌলিকত্বের অভাবে গবেষণা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত গবেষণা ফলাফল জ্ঞানের জগতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

খ. স্বচ্ছ ধারণা ও পদ (Clear Concept and Term)

গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে। ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ দ্ব্যর্থহীন করার জন্য যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সুস্পষ্ট করতে হবে যাতে বিশেষ অর্থে ব্যবহার ছাড়া কেউ অন্য কোনো অর্থে সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। সমগ্র প্রতিবেদনের যেখানেই উক্ত ধারণা বা পদসমূহ ব্যবহৃত হবে সেখানেই সংজ্ঞার সাথে সংগতি রেখে তা ব্যবহার করতে হবে। সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হলো গবেষক কি বিশেষ অর্থে কোনো পদ ব্যবহার করতে চান তা সুনির্দিষ্ট করা। এমন অনেক পদ আছে যা সাধারণভাবে এক অর্থ প্রকাশ করে এবং যখন তা একাডেমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রেও উক্ত পদকে যথার্থ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এমন অনেক ধারণা ও পদ আছে যা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রায়োগিক

সংজ্ঞা (Operational definition) প্রদানের মাধ্যমে সেগুলো স্পষ্ট করতে হবে যাতে গবেষক কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা পাঠকের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হলো ধারণা বা পদকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বোধগম্য করা। এভাবে গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণা ও পদের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করলে পাঠকের পক্ষে গবেষণাকর্মটি বুঝতে এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না।

গ. সহজ এবং সঠিক ভাষা (Easy and Appropriate Language)

প্রতিবেদন লেখার কাজে ব্যবহৃত ভাষা সহজ-সরল, প্রাণবন্ত ও সঠিক হতে হবে যাতে পাঠকের পক্ষে প্রতিবেদনটি অনুধাবন করা সহজ হয়। একমাত্র উদ্ধৃতি (Quotation) ছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনে জটিল, দুর্বোধ্য কিংবা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষায় অতীত কাল (Past tense) এবং তৃতীয় পুরুষের (Third person) ব্যবহার হয়। সমগ্র প্রতিবেদনে একই প্রকার বানান ও রচনারীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ. সুশৃঙ্খল উপস্থাপন (Orderly Presentation)

সমগ্র প্রতিবেদনটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার মধ্যে একটি পূর্ণ সংগতি বজায় থাকে। পুরো প্রতিবেদনটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থাপন করলে পাঠকের কাছে তা সুখকর পাঠ হিসেবে আবেদন রাখতে সক্ষম হয়। সমগ্র প্রতিবেদনটিকে কতকগুলো অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কতকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগতি সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ একটি শিরোনাম এবং এর বিভিন্ন উপ-বিভাগের জন্য একাধিক উপ-শিরোনাম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের এবং উপ-অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে যেন বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংগতি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঙ. উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার (Use of Quotation and Footnote)

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার করতে হবে। কোনো স্বীকৃত গবেষকের অভিমত উল্লেখ করে বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর সপক্ষের যুক্তিকে আরো সুদৃঢ় করা অথবা কোনো বিষয়ে কোনো গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য যদি একই রকম বা ভিন্ন রকম হয় তবে তা উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কোনো বক্তব্যকে ভাষান্তর করলে বা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করলে ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার বা ভুল বুঝার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির ব্যবহার দরকার হয়। গবেষণার প্রতিবেদনে অত্যধিক পরিমাণে কিংবা অতি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ এতে পাঠক তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে।

উদ্ধৃতির উৎস পাঠককে অবগতকরণের উদ্দেশ্যে পাদটীকা ব্যবহার করা হয়। উদ্ধৃতির পাদটীকা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে মূল উৎস খুঁজে বের করে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লাভে সহায়তা করে। পাদটীকা যে সব সময়ই উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন নয়। কোনো লেখক বা গবেষকের কোনো গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থেকে কোনো বক্তব্য, ধারণা, যুক্তি বা ফলাফলের সহায়তা গ্রহণ করলে পাদটীকা বা গ্রন্থপঞ্জিতে তা উল্লেখ করতে হয়। পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জির ব্যবহার থাকলে উক্ত গবেষণাকর্মটি ব্যবহার করে পরবর্তীকালে অন্যান্য গবেষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরিচালিত গবেষণার কাজ সহজ উপায়ে সম্পাদন করতে পারেন।

চ. প্রতিবেদনের আকার (Size of the Report)

প্রতিবেদনের গুণগত মান এর আকার বা আয়তনের উপর মোটেই নির্ভর করে না। কারণ একটি প্রতিবেদন আকারে বড় হলেই যে তা ভালো হবে এবং আকারে ছোট হলেই যে তার গুণগত মান দুর্বল হবে এমন কথার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। একটি প্রতিবেদনের আকার তার প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া উচিত, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কোনো প্রতিবেদনের আকার বড় বা ছোট করা সমীচীন নয়। সংগৃহীত তথ্যের উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সন্নিবেশকরণের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় ও পদ্ধতির বর্ণনা ও আলোচনার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু আকারের প্রতিবেদন তৈরি করার দরকার হয় প্রতিবেদনের বিস্তৃতি ততটুকুই হবে। এর সামান্য বেশিও নয়, আবার কমও নয়। শুধুই প্রতিবেদনের আকার বৃদ্ধির জন্য অযথা কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা, কিংবা অপ্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা কোনোটাই যুক্তিযুক্ত নয়। সাধারণত একটি প্রতিবেদনের আকার A4 সাইজের কাগজে সর্বনিম্ন ১০০ পৃষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ ৩৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া ভালো। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

ছ. ত্রুটি স্বীকার

একটি সামাজিক গবেষণা বিশাল প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তথ্য সংগ্রহে জটিলতা, বিশেষ করে নমুনায়নের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরশীলতা সব গবেষণায় সমান থাকে না। বিশেষ করে যেসব সামাজিক গবেষণা মাঠ পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরিচালিত হয়, তার নির্ভরশীলতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। গবেষণার ফলাফল শুধু গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষক অনুরূপ গবেষণাকর্মে তা ব্যবহার করতে পারেন ; আবার উক্ত গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে পরিচালিত কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণা প্রতিবেদনে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ না থাকলে ব্যবহারকারীগণ উক্ত গবেষণার ফলাফল নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে বসতে পারেন, যার ফলাফল পরবর্তীকালে অশুভ ও নেতিবাচক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একটি উত্তম প্রতিবেদনে গবেষণার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করা একান্ত দরকার। পূর্ব থেকেই গবেষণার ফলাফলের সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে জানা থাকলে এর সমাধানে যত্নবান হওয়া যায় অথবা এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

প্রতিবেদনের রূপ কেমন হওয়া উচিত

প্রতিবেদনের রূপ ঠিক কেমন হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিবেদন তৈরি করলে প্রতিবেদনটি একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ পাবে বলে আশা করা যায়।

* প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংগৃহীত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মতভাবে তা প্রণয়ন করতে হবে। কেউ যদি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি আন্তরিকভাবে চাইলে যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার যথার্থতা যাচাই করতে পারেন।
* প্রতিবেদনটিকে একটি পরিপূর্ণ রূপ পেতে হবে। অর্থাৎ এটি যেন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের রূপ নেয়। এর অর্থ হলো গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুযায়ী সব প্রয়োজনীয় বিষয়ই যেন এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনো কিছুই যেন আলোচনা থেকে বাদ না পড়ে।
* প্রতিবেদন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। এটা বিশাল আকারের হলে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ আবার এই নয় যে, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে এর আয়তন ছোট করতে হবে।
* প্রতিবেদন সুস্পষ্ট হতে হবে। এর কোনো ধারণা বা পদের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকা মোটেই উচিত নয়। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ধারণা বা পদসমূহকে কী অর্থে গবেষক ব্যবহার করেছেন তা উক্ত ধারণা ও পদসমূহের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করতে হবে, যাতে কেউ এর ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারে। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত ধারণা ও পদের মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক ভাব বিদ্যমান থাকলে গবেষণার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয় এবং গবেষকের বক্তব্য অবিকৃতভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে না।
* প্রতিবেদনের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত হতে হবে যাতে যাদের উদ্দেশ্যে প্রণীত তাদের কাছে তা বোধগম্য হয়। পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সজাগ থেকে প্রতিবেদনে সে অনুযায়ী ভাষা ও শব্দাবলি ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেদন যদি কেবল শিক্ষাবিদ বা সমাজ গবেষকদের জন্য প্রণীত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল শব্দাবলি (Technical words) নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
* গবেষককে বুদ্ধিগত দিক থেকে সৎ (Intellectually honest) থাকতে হবে। তাঁর জানা মতে তিনি কখনোই মিথ্যা বা ভুলের প্রশ্রয় দেবেন না।
* প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাঠক মনে আগ্রহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে প্রতিবেদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকের কাছে চির অজানাই রয়ে যাবে।

* প্রতিবেদনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এর কোথাও যেন কোনো প্রকার ছন্দপতন না ঘটে। প্রত্যেক অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের মধ্যে সংগতি রেখে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্টতার অভাবে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট না হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো (Structure of a Report)

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার জন্য একক কোনো স্বীকৃত কাঠামো নেই। তবে যে কোনো ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় কতিপয় সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে কোনো প্রতিবেদন প্রণীত হলে তা একটি সর্বজনীন আকৃতি সম্বলিত প্রতিবেদনের রূপ লাভ করে ; অর্থাৎ প্রতিবেদনটি চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত কাঠামো লাভ করতে সমর্থ হয়।

একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে। যথা :

ক. প্রারম্ভিক অংশ
খ. মূল অংশ
গ. নির্দেশিকা

বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনের উল্লিখিত প্রতিটি অংশ আবার বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে অতি ক্ষুদ্র প্রতিবেদন শুধু শিরোনাম পৃষ্ঠা ও মূল অংশ—এই দুভাগে বিভক্ত হতে পারে। সাধারণভাবে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় নিম্নোক্তভাবে গঠন কাঠামো অনুসরণ করা হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কোনো নতুন অংশ এতে সংযোজিত হয়, আবার কোনো কোনো অংশ বাদ পড়ে যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের পার্থক্য হেতুই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নিচে উক্ত অংশসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ক. প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম
২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৩. সারসংক্ষেপ
৪. ভূমিকা এবং/বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ভূমিকার অংশ হিসেবে ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ; আবার আলাদাভাবেও দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।
৫. সূচিপত্র
৬. সারণি তালিকা
৭. মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা

খ. মূল অংশ

১. সূচনা
১.১. গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি
১.৩. গবেষণার প্রকল্পন বা অনুমান
২. গবেষণা পদ্ধতি
২.১. নমুনা
২.২. উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি
২.৩. গবেষণার নকশা ও প্রক্রিয়া
৩. ফলাফল
৪. আলোচনা ও সুপারিশ

গ. নির্দেশিকা
১. পরিশিষ্ট
২. গ্রন্থপঞ্জি

প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

ক. প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম : প্রতিবেদনের শিরোনামের মধ্য দিয়ে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু প্রকাশ পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, শিরোনামে গবেষণার প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিরোনাম এমন হতে হবে যাতে শিরোনাম পড়েই বুঝা যায় সম্পূর্ণ প্রতিবেদনে কি বলতে চাওয়া হয়েছে। শিরোনামটি সঠিক, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। প্রতিবেদন ইংরেজিতে লেখা হলে শিরোনামটি সম্পূর্ণ Capital Letter-এ টাইপ করাই ভালো। নিচে গবেষণা প্রতিবেদনের কয়েকটি শিরোনামের উদাহরণ দেওয়া হলো :

Inter-country comparison of public enterprise performance : An application to the cement industry of South Asia

Foodgrains demand elasticities of rural households in Bangladesh—an analysis of pooled cross-section data

Structural change and poverty in Bangladesh : The case of a false turning point

মৌলিক জাতিগত স্বভাব বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন : ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশল

২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম : শিরোনামের একটু নিচে একই পৃষ্ঠায় গবেষকের (বা গবেষকদের) নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। কোনো জার্নালে প্রকাশ করার জন্য লিখিত প্রতিবেদনে গবেষকের নামের সাথে তার ডিগ্রি বা শিক্ষাগতযোগ্যতা, পদ বা পদমর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ডিগ্রি লাভের জন্য লিখিত থিসিস-এর ক্ষেত্রে যে ডিগ্রির জন্য থিসিস লেখা হয় সেই ডিগ্রির নাম এবং থিসিস জমা দেওয়ার সাল ও তারিখ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঠিকানা লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে লেখা

হয় যেমন, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমাজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, খালিশপুর, খুলনা।

৩. সারসংক্ষেপ : গবেষণা প্রতিবেদনের এই অংশে গবেষণার মূল বিষয় অতি সংক্ষেপে (অনূর্ধ্ব দুই পৃষ্ঠা বা ২০০ থেকে ৪০০ বাক্যে) তুলে ধরা হয়। সারসংক্ষেপ পাঠের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ অতি অল্প সময়ে সমগ্র গবেষণা বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সারসংক্ষেপ পাঠ করার পর কোনো পাঠক যদি মনে করেন যে, সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি তাঁর পাঠ করার দরকার অথবা সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি পাঠ করার তাঁর প্রয়োজন নেই, তবে সেভাবে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। সারসংক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, মূল বিষয়ের বিবরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিধৃত হয়।

৪. ভূমিকা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গবেষক কেন বিষয়টির উপর গবেষণা পরিচালনা করতে আগ্রহী হলেন এ সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য ভূমিকায় স্থান পায়। এ ছাড়াও গবেষণার বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য এ অংশে ব্যক্ত করা হয়।

বৃহদায়তনের গবেষণা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গবেষককে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তাই গবেষক প্রতিবেদনে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার সাধারণত ভূমিকার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে ভূমিকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দিলে, গবেষক সে ক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শিরোনামে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

৫. সূচিপত্র : সূচিপত্র প্রতিবেদনের কোন পৃষ্ঠায় কি আছে তা ব্যক্ত করে। তাই কেবল থিসিস বা বড় আকারের গবেষণা প্রতিবেদনে সূচিপত্র দিতে হয়। জার্নালে প্রকাশের জন্য লিখিত কোনো প্রতিবেদনে বা অতি ছোট আকারের কোনো প্রতিবেদনে সূচিপত্র দেওয়ার দরকার হয় না। একটি বড় আকারের গবেষণা প্রতিবেদনের সূচিপত্রে অধ্যায়সমূহের নাম এবং অনেক ক্ষেত্রে উপ-অধ্যায়সমূহের নামও উল্লেখ করা হয়। অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের অবস্থান প্রতিবেদনের কত পৃষ্ঠায় তাও অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের বিপরীতে ভূমিকা বা সমস্যার বিবরণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার, সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক গবেষণা, গবেষণা পদ্ধতি বা উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে। এছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে সারণি তালিকা, চিত্র তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্টের উপস্থাপনাও সূচিপত্রে স্থান লাভ করে। সূচিপত্রে উল্লিখিত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের সাথে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের হুবহু মিল থাকা দরকার। অন্যথায় সূচিপত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

৬. সারণি তালিকা : গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ উপস্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য ও সুবিধাজনক পদ্ধতি হলো সারণি। একটি তথ্যবহুল বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনে একাধিক সারণি থাকতে পারে। বৃহদাকার প্রতিবেদনের মধ্য থেকে অতি সহজেই যাতে সংযোজিত সারণি খুঁজে বের করা সম্ভব হয় সেজন্য পূর্বেই সারণির শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়।

খ. মূল অংশ

১. সূচনা : সাধারণত একটি ভূমিকা প্রদানের মাধ্যমে মূল প্রতিবেদন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে একে প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ভূমিকা আকারে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সূচনা নামধারী এই অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূচনায় আলোচিত বিষয় সংক্ষিপ্ত হলে গবেষক অনেক সময় এর অধ্যায় নম্বর নাও দিতে পারেন। তবে এ কথা সত্য যে, সূচনায় অধ্যায় নম্বর দেওয়া হোক আর না হোক, এটি কিন্তু প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণেই সূচনা থেকে প্রতিবেদনের পৃষ্ঠাসংখ্যা শুরু হয়। সূচনায় সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

* সংশ্লিষ্ট গবেষণার পটভূমি—কেন বা কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।
* গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান যাতে গবেষণা সমস্যা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে বা কেউ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারে।
* গবেষণার উদ্দেশ্য।
* প্রতিবেদনে ব্যবহৃত প্রত্যয় ও অনুমানসমূহ।
* গবেষণার যৌক্তিকতা।
* গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা।
* গবেষণা এককসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।
* তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের বিবরণ।
* তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'নমুনায়ন পদ্ধতি' ব্যবহৃত হলে সমগ্রকের বিশদ বর্ণনাসহ নমুনায়নের বিশেষ পদ্ধতির বিবরণ ও উক্ত বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণের পেছনে যুক্তি, নমুনার পরিমাণ, নমুনার প্রতিনিধিত্বকারী যোগ্যতা, ত্রুটিসমূহ যাচাই ব্যবস্থা ইত্যাদির সুস্পষ্ট ও বিশদ বিবরণ দেওয়ার দরকার হয়।
* গুণাত্মক তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পরিমাপক পদ্ধতি।
* তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি।
* গবেষণা পরিচালনার মেয়াদকাল, বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত সময়ের পরিমাণ।
* গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ, অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ, উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষককে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি : প্রতিবেদনের এ অংশে সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য যে উপযুক্ত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তভুক্ত থাকে :

* গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি, নমুনার আকার এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ।
* গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ।
* গবেষণা পরিকল্পনা বা নকশা।

৩. ফলাফল : গবেষণা প্রতিবেদনের এ অংশে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ছক বা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে অধিকতর সহজবোধ্য করে তোলা হয়। তবে ছক বা চিত্রের ব্যবহার মূলত নির্ভর করে সংগৃহীত তথ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর। উপাত্তের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করাই ছক বা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। উপাত্ত উপস্থাপনের প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার কৌশলের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন কৌশল দিন দিন সংযোজিত হচ্ছে। এসব কৌশল থেকে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কৌশল বাছাই করে নিতে হয়। গবেষককে স্মরণ রাখতে হবে, কোন উপস্থাপন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে গবেষণা ফলাফলকে সব থেকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। সারণি, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আকার যদি বৃহৎ হয় এবং সেগুলো যদি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশে সংযোজন না করে পরিশিষ্টে সংযোজন করাই ভালো। তবে তথ্যের আলোচনার স্থানে ঐ তথ্য সম্পর্কিত সারণি, রেখাচিত্র বা মানচিত্র পরিশিষ্টের কত পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার যাতে পাঠক ইচ্ছে করলেই সংশ্লিষ্ট সারণি, রেখাচিত্র বা মানচিত্রটি দেখতে পারেন। গবেষণা ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যও প্রতিবেদনের এ অংশে উপস্থাপিত হয় যাতে পরবর্তীকালে গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন।

৪. আলোচনা ও সুপারিশ : প্রতিবেদনের এ অংশে গবেষণা ফলাফলের ব্যাখ্যা করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের কোনো সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় কিনা তা জানার জন্য এদের তুলনা করা হয় এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এছাড়াও প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। এর অর্থ এই যে, গবেষণা ফলাফল নতুন কোনো তত্ত্ব বা জ্ঞানের জন্ম দেয়, না প্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্বকে সমর্থন দান করে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। গবেষণা ফলাফল পূর্বেনির্ধারিত গবেষণা প্রকল্পন সমর্থন করে কিনা, না করলে তার কারণ কি ইত্যাদি সম্পর্কেও এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হলে এ অংশে তা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গবেষণা বিষয়ের যে-সব ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে গবেষণা পরিচালনার সুযোগ রয়েছে সে-সব ক্ষেত্র সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়।

গ. নির্দেশিকা

১. পরিশিষ্ট : গবেষণা পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যে-সব তথ্য-প্রমাণ এবং বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রতিবেদনের মূল অংশে সরাসরি সংযোজন করা সম্ভবপর হয় না, সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশ শেষে পরিশিষ্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। অনেক সময় সারণি, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আয়তন অনেক বড় হলে এবং তা বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হলে সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশে উপস্থাপন না করে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া ভবিষ্যতে অন্য কোনো গবেষকের

কাজে আসবে এই আশায়ও অনেক তথ্য-প্রমাণ ও অশোধিত উপাত্ত গবেষক পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেন।

২. গ্রন্থপঞ্জি : গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব বই-পুস্তক, জার্নাল বা পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তি মজবুত করা।

প্রতিবেদনের এ অংশে বই-পুস্তক এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখকদের নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে (Alphabetically) লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক লেখকের নামের পর তাঁর প্রবন্ধ বা বই-পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান, সন ইত্যাদি তথ্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কিত তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করার নিয়ম গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

George A. Akerlof and Janet L. Yellen (eds.). *Efficiency Wage Models of the Labor Force*. London : Cambridge University Press, 1986, "Introduction", pp. 1-21.

John R. Harris and Michael P. Todaro. "Migration, Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis", *American Economic Review*, 60 (March 1970), 126-42.

মান্নান, এম. এ. *বিপণন যুগে যুগে*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, রয়েল লাইব্রেরি, ঢাকা, পৃ. ৪৫, ৫৪।

ইসলাম, টি. (১৯৮৮) : "ইসলামি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ : সমস্যা ও সমাধান"। ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, আঞ্চলিক সেমিনার IERB-এর সৌজন্যে, ঢাকা।

পরিশিষ্ট

একটি প্রশ্নমালার নমুনা

কুষ্টিয়া জেলাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ
অর্থনীতি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
(পরিবার প্রধানের সাথে সাক্ষাৎকার)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম : ... ... তারিখ ... ...

১. উত্তরদাতার নাম ... ... অনুসূচি নং ... ...

ও

ঠিকানা ... ... নমুনা নং ... ...

... ...

২. আপনার বয়স কত?

বছর

২০-৩০ ☐

৩১-৪০ ☐

৪১-৫০ ☐

৫১-৬০ ☐

৬১-৭০ ☐

৭১-৮০ ☐

৮১ ও তার উর্ধ্বে ☐

৩. আপনার ধর্ম কি?

ইসলাম ☐

হিন্দু ☐

বৌদ্ধ ☐

খ্রিষ্টান ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

৪. আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি?

☐ বিবাহিত

☐ অবিবাহিত

☐ বিধবা / বিপত্নীক

☐ পরিত্যক্ত

৫. আপনার পরিবারের অন্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য দিন।

ক্রমিক নম্বর	সদস্যদের নাম	পরিবার প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষা	পেশা	আয়
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						

৬. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

মোটেও নেই ☐

সামান্য লিখতে ও পড়তে পারি ☐

প্রাথমিক ☐

নিম্ন মাধ্যমিক ☐

মাধ্যমিক ☐

উচ্চ মাধ্যমিক ☐

স্নাতক মান ☐

স্নাতকোত্তর ☐

কারিগরি ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

৭. (ক) স্কুলে যায় না এমন ছেলেমেয়ে কি আছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) না গেলে তার কারণ কি?

অর্থনৈতিক ☐

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ☐

উৎসাহের অভাব ☐

অল্প বয়স ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

৮. আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন।

চাকুরি ☐

ব্যবসা ☐

স্বাধীন পেশা ☐

দিনমজুরি ☐

বেকার ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

৯. আপনার আয়ের উৎস সম্পর্কে বলুন।

চাকুরি ☐

ব্যবসা ☐

স্বাধীন পেশা ☐

বাড়িভাড়া ☐

জমি থেকে আয় ☐

বিদেশী টাকা ☐

অন্য কোনো উৎস ☐ নির্দিষ্ট করুন।

১০. আপনার মাসিক পারিবারিক আয় কত?

টাকা

০ – ৫০০ ☐

৫০১ – ১০০০ ☐

১০০১ – ১৫০০ ☐

১৫০১ – ২০০০ ☐

২০০১ – ২৫০০ ☐

২৫০১ – ৩০০০ ☐

৩০০১ – ৩৫০০ ☐

৩৫০১ – ৪০০০ ☐

৪০০১ ও তার উর্ধ্বে ☐

১১. (ক) আপনার পরিবারের কেউ কি বেকার আছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) বেকার থাকলে তাদের সম্পর্কে বলুন।

ক্রমিক নং	সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কতদিন বেকার

(গ) বেকারত্বের কারণ সম্পর্কে বলুন।

... ...

... ...

... ...

১২. আপনার বাসগৃহ সম্পর্কে বলুন।

নিজস্ব ☐

সরকারি ☐

ভাড়া ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

১৩. আপনার বাসগৃহ কি —

পাকা ☐

আধা-পাকা ☐

টিনের ☐

কাঁচা ☐

অন্যরকম ☐ নির্দিষ্ট করুন।

১৪. আপনার বাসগৃহে মোট কয়টি কামরা আছে?

কক্ষ সংখ্যা ☐

১৫. আপনার গোসলখানার ধরন ও সংখ্যা সম্পর্কে বলুন।

ধরন		সংখ্যা
পাকা	☐	☐
আধা-পাকা	☐	☐
কাঁচা	☐	☐
অন্যরকম	☐ নির্দিষ্ট করুন।	☐

১৬. আপনার গৃহে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৭. আপনার গৃহের ময়লা ও আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কি?

প্রত্যেক দিন সাফ করা হয় ☐

প্রতি সপ্তাহে সাফ করা হয় ☐

প্রতি মাসে সাফ করা হয় ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

ঝাড়ুদার আছে ☐

কাজের লোক আছে ☐

নর্দমা ব্যবস্থা আছে ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

১৮. পয়ঃপ্রণালির (পায়খানা) ধরন ও সংখ্যা সম্পর্কে বলুন।

ধরন		সংখ্যা
পাকা	☐	☐
আধা-পাকা	☐	☐

কাঁচা			
সেনেটারি			
অন্যান্য		নির্দিষ্ট করুন।	

১৯. (ক) বর্তমানে আপনার এলাকায় বিশেষ ধরনের কোনো অসুবিধা আছে কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয় তবে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

- বিশুদ্ধ পানির অভাব ☐
- সচরাচর ব্যবহারের পানির অভাব ☐
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অভাব ☐
- নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ☐
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ☐
- বিনোদন ব্যবস্থার অভাব ☐
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অভাব ☐
- চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব ☐
- ভালো রাস্তা-ঘাটের অভাব ☐
- আইন শৃঙ্খলার অভাব ☐
- অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

২০. উপরের সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আশু সমাধান করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

(ক) ... ...

(খ) ... ...

(গ) ... ...

(ঘ) ... ...

(ঙ) ... ...

২১. উক্ত অসুবিধাসমূহ কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

সরকারি উদ্যোগ ☐

এন জি ও-এর সহায়তায় ☐

এলাকাবাসীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় ☐

সরকারি ও এলাকবাসীর যৌথ উদ্যোগে ☐

বিদেশী সাহায্যের দ্বারা ☐

অন্যান্য ☐ নির্দিষ্ট করুন।

২২. আপনার এলাকায় কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে?

... ...

... ...

২৩. (ক) আপনার এলাকায় সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) থাকলে, তারা কি ধরনের কাজ করে থাকে তার বর্ণনা দিন।

... ...

... ...

... ...

২৪. (ক) নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) প্রয়োজন থাকলে তা কি ধরনের প্রতিষ্ঠান তার বর্ণনা দিন।

... ...

... ...

... ...

গবেষণা পরিভাষা

Abstract	সারসংক্ষেপ
Accidental sampling	আকস্মিক নমুনায়ন
Accuracy	নির্ভুলতা
Action research	কার্যোপযোগী গবেষণা
Advantage	সুবিধা
Alphabetically	বর্ণমালানুসারে
Analysis	বিশ্লেষণ
Anthropological method	নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
Appendix	পরিশিষ্ট
Applied research	ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা
Area sampling	ক্ষেত্র নমুনায়ন
Appropriate technology	লাগসই প্রযুক্তি
Band curve	স্তর রেখা
Band-diagram	দণ্ডচিত্র
Base	ভিত্তি
Basic	মূল
Basic concept	মৌলিক ধারণা
Basic research	মৌলিক গবেষণা
Basis	ভিত্তি
Bias	পক্ষপাত
Bias of patriotism	দেশপ্রেমজনিত পক্ষপাত
Bibliography	গ্রন্থপঞ্জি
Case study	বিষয়-সমীক্ষা
Case study method	বিষয়-সমীক্ষা পদ্ধতি
Central	কেন্দ্রীয়
Chance	দৈব
Checklist	নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা
Class bias	শ্রেণীজনিত পক্ষপাত
Classification	শ্রেণীবদ্ধকরণ
Cluster sampling	গুচ্ছ নমুনায়ন

Coding	সংকেতায়ন
Comparative method	তুলনামূলক পদ্ধতি
Concept	প্রত্যয়
Consistency	পূর্বাপর সংগতি
Content analysis method	বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি
Content validity	বস্তুগত যথার্থতা
Continuous	অবিচ্ছিন্ন
Controlled	নিয়ন্ত্রিত
Crude	অশোধিত
Correlation	সহ-সম্বন্ধ
Data	তথ্য
Data collection	তথ্য সংগ্রহ
Definition	সংজ্ঞা
Dependent	অধীন
Dependent variable	অধীন চলক
Design	নকশা
Diagram	রেখাচিত্র
Dichotomous	দ্বিমুখী
Disadvantage	অসুবিধা
Discrete	বিচ্ছিন্ন
Discrimination	পৃথকীকরণমূলক
Ellipses	উদ্ধৃতির উহ্য অংশ
Emotional bias	উত্তেজনাবশত পক্ষপাত
Environment	পরিবেশ
Estimate	নিরূপণ
Experiment	পরীক্ষণ
Experimental	পরীক্ষামূলক
Experimental method	পরীক্ষামূলক পদ্ধতি
Exploratory	অনুসন্ধানমূলক
Extrapolation	বহিঃপ্রক্ষেপ
Field editing	প্রশ্নমালা সম্পাদন
Fixed-response	নির্ধারিত উত্তরমূলক
Footnote	পাদটীকা
Forced choice	বাধ্যতামূলক নির্বাচন
Formal	আনুষ্ঠানিক
Formulation	গঠন
Framework	কাঠামো

Frequency	গণসংখ্যা
Frequency distribution	গণসংখ্যা নিবেশন
Fundamental research	মৌলিক গবেষণা
Generalization	সাধারণীকরণ বা সামান্যীকরণ
Geographical	ভৌগোলিক
Diagnostic	নিদানমূলক
Graph	রেখাচিত্র
Graphic	রৈখিক
Hallo effect	পরিচিতি প্রভাব
Historical materialism	ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
Historical method	ঐতিহাসিক পদ্ধতি
Histogram	আয়তলেখ
Historigram	কালীন লেখ
Homogeneity	সমরূপতা
Hypothesis	প্রকল্পন
Independent variable	স্বাধীন চলক
Informal	অনানুষ্ঠানিক
Intellectual bias	বুদ্ধিগত পক্ষপাত
Intellectually honest	বুদ্ধিগত দিক থেকে সৎ
Interview guide	সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা
Interview method	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
Level	মাত্রা
Level of accuracy	নির্ভুলতার মাত্রা
Library method	লাইব্রেরি পদ্ধতি
Location	অবস্থান
Logical	যৌক্তিক
Manifold	বহুমুখী
Map	মানচিত্র
Measurable	পরিমাপযোগ্য বা পরিমেয়
Measurement	পরিমাপ
Method	পদ্ধতি
Method of successive categores	অনুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি
Methodology	প্রণালি
Motivation	প্রেষণা
Mutually independent	পরস্পর স্বাধীন
Natural	প্রাকৃতিক
Naturalistic	প্রাকৃতিক

Non-participant	অংশগ্রহণবিহীন
Non-probability	নিঃসম্ভাবনা
Non-probability sampling	নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন
Normative method	নিয়মানুগ পদ্ধতি
Numerical	সংখ্যাভিত্তিক
Objective	উদ্দেশ্য
Observation	পর্যবেক্ষণ
Open-end questionnaire	উন্মুক্ত প্রশ্নমালা
Orderly	সুশৃঙ্খল
Original research	মূল বা আদি গবেষণা
Paired bars	যুগল দণ্ডচিত্র
Participant	কর্মী
Pictogram	রূপচিত্র
Philosophical method	দার্শনিক পদ্ধতি
Pie-chart	বৃত্তচিত্র
Pilot survey	অগ্রবর্তী জরিপ
Plan	পরিকল্পনা
Political bias	রাজনৈতিক পক্ষপাত
Polygon	বহুভুজ
Population survey	সমগ্রক জরিপ
Predetermined	পূর্বনির্ধারিত
Prediction	পূর্বানুমান
Predictive	পূর্বাভাসমূলক
Pre-test	পূর্বযাচাই
Primary data	প্রাথমিক উপাত্ত
Primary source	প্রাথমিক উৎস
Presentation	উপস্থাপন
Probability	সম্ভাবনা
Probability sampling	সম্ভাবনা নমুনায়ন
Procedure	প্রক্রিয়া
Process	প্রক্রিয়া
Processing	প্রক্রিয়াজাতকরণ
Psychological environment	মানসিক পরিবেশ
Pure research	বিশুদ্ধ গবেষণা
Purposive	উদ্দেশ্যমূলক
Purposive sampling	উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন
Qualitative	গুণভিত্তিক

★ BANSDOC Library Dhaka ★

Quality	গুণ
Quantitative	পরিমাণভিত্তিক
Questionnaire	প্রশ্নমালা
Questionnaire method	প্রশ্নমালা পদ্ধতি
Quota sampling	আনুমানিক অংশ নমুনায়ন
Quotation	উদ্ধৃতি
Random	দৈবচয়িত
Randomization	দৈবায়ন
Range curve	ব্যাপ্তি রেখা
Rationale	যৌক্তিকতা
Raw data	অশোধিত উপাত্ত
Reference	নির্দেশিকা বা সূত্র
Reliability	নির্ভরযোগ্যতা
Replacement	প্রতিস্থাপন
Report	প্রতিবেদন
Representative	প্রতিনিধিত্বকারী
Representativeness	প্রতিনিধিত্বশীলতা
Research design	গবেষণা নকশা
Research problem	গবেষণা সমস্যা
Research proposal	গবেষণা প্রস্তাবনা
Sample	নমুনা
Sample method	জরিপ পদ্ধতি
Sample survey	নমুনা জরিপ
Sampling	নমুনায়ন
Sampling error	নমুনা বিচ্যুতি
Schedule	অনুসূচি
Score	সাফল্যাংক
Secondary data	গৌণ উপাত্ত
Secondary source	গৌণ উৎস
Selective	নির্বাচনমূলক
Sequence	ধারাবাহিকতা
Simple random sampling	সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন
Size of sampling	নমুনার আকার
Social system	সমাজব্যবস্থা
Source	উৎস
Standard	আদর্শ
Statistical induction	তথ্যমূলক উপপত্তি

গ্রন্থপঞ্জি

Acoff, R. L.

The Design of Social Research, University of Chicago Press, Chicago and London, 1953.

Anderson, T. W.

Introduction to Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1958.

Baker, R. P. and Howell, A. C.

The Preparation of Reports, Ronald Pres, New York, 1938.

Berelson, Bernard.

Content Analysis in Communication Research, Free Press, New York, 1952.

Berenson, Conard, and Colton, Raymond.

Research and Report Writing for Business and Exonomics, Random Press, New York, 1971.

Bottomore, T. B.

Sociology, Blackie & Son Ltd., India, 1975.

Chance, William A.

Statistical Methods for Decision Making, D. B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., Bombay, 1975.

Cooley, William W. and Lohnes, Paul R.

Multivariate Data Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1971.

Deming, W. Edwards.

Sample Design in Business Research, John Wiley & Sons, New York, 1960.

Dennis, Child.

The Essential of Factor Analysis, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1973.

Emory, C. William.

Business Research Methods, Rechard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois, 1976.

BANSDOC Library
Accession No. 18398

Freedman, P.

The Principals of Scientific Research, 2nd ed., Pergamon Press, New York, 1960.

Ferber, Robert (ed.)

Handbook of Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., New York, 1948.

Ferber, R. and Verdoom, P. J.

Research Methods in Economics and Business, The Macmillan Company, New York, 1962.

Fisher, R. A.

Statistical Methods for Research Workers, 13th ed., Hafner Publishing Co., New York, 1958.

Ghosh, B. N.

Scientific Methods and Social Research, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhis, 1982.

Gibbons, J. D.

Nonparametric Statistical Inference, McGraw-Hill Kogakusha Ltd., (International Student Edition), Tokyo, 1971.

Gopal, M. H.

An Introduction to Research Procedure in Social Science, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

Kothari, C. R.

Research Methodology, New Age International Limited, India, 1994.

Moser, C. A. and Calton, G.

Survey Methods in Social Investigation, Basic Books, New York, 1972.

Nagel, Stuart S. and Neef, Marian.

Policy Analysis in Social Science Research, Sage Publications, London, 1979.

Northrop, F. S. C.

The Logic of Science and Humanities, Macmillan, London, 1947.

Oppenheim, A. N.

Questionnaire Design and Attitude Measurement, Basic Books, New York, 1966.

Rose, Ranold Marshall.

Theory and Methods of the Social Science, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1954.

Salahuddin, M. A.

Introduction to Social Research, Bangladesh Publishers, Dhaka, 1991.

Scates, D. E. and Yeoman, A.

The Effects of Questionnaire Form on Course Request of Employed Adults, American Council of Education, Washington, 1950.

Takeuchi, K. Yanai, H. and Mukherjee, N. B.

The Foundation of Multivariate Analysis, Wiley Eastern Ltd., New Delhi, 1982.

Tandon, B. C.

Research Methodology in Social Science, Chaitanya Publishing House, Allahabad, 1979.

Travers, Robert M. W.

An Introduction to Educational Research, 4th ed., Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1978.

Warwick, D. P. and Lininger, C. A.

The Sample Survey : Theory and Practice, McGraw-Hill, New York, 1975.

Williamson, J. and Karp, D.

The Research Craft : An Introduction to Social Science Methods, Little-Brown, Boston, 1977.

Yamane, T.

Statistics : An Introductory Analysis, 3rd ed., Harper and Row, New York, 1973.

Young, P. V.

Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall of India, New Delhi, 1975.

আবদুল মালেক, নীহাররঞ্জন সরকার ও আজিজুর রহমান

সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯০।

কাজী আবদুর রউফ ও মউদুদ ইলাহী

সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

খুরশিদ আলম

সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৩।